ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর-১০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর আর রহমান নিজেদের কামরায় ফিরে এলো।

যার যার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করল তারা। রহমান শয্যায় বসে বলল– সর্দার, যুবতীটাকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যা রহমান, আমার মনে হয় এমনি প্রতি রাতে ওখানে একটা নারী হত্যা হয়ে থাকে।

রহমান অস্ফুট কণ্ঠে বলল– কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ভাগ্যিস তুমি ভিতরে লাফিয়ে প্রবেশ করনি রহমান।

সর্দার আর একটু হলেই আমি ভিতরে প্রবেশ করে কুমার মঙ্গলসিন্ধকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দিতাম।

ভুল করতে রহমান। কারণ এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে সক্ষম হইনি। বিশেষ করে এখনও আমাদের অনেক জানার বাকী রয়েছে।

না জানি বৌরাণী কোথায়।

হ্যাঁ রহমান। একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল বনহুর— কি অবস্থায় আছে সে— বেঁছে আছে কিনা তাই বা কে জানে। রহমান যদি তার কিছু হয়ে থাকে সে জন্য দায়ী আমি— আমি। আমারই ভুলের জন্য একটি সুন্দরী ফুলের মত জীবন -----

রহমান হলে উঠে— সর্দার, আমার মন বলছে, তিনি বেঁছে আছেন, ভালই আছেন—

তোমার কথা যেন সত্য হয় রহমান। বনহুর চাদরটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল।

রহমানও শয্যা গ্রহণ করল।

কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই—একটু পূর্বে যে দৃশ্য তারা দেখেছে তা অতি জঘন্য—অতি মর্মান্তিক। এ দৃশ্য দেখার পর কারও চোখে ঘুম আসতে পারে না।

মহারাজ জয়সিন্ধের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল বনহুর—আর রহমান ভেবেছিল সত্যি এ এক মহৎ রাজার দেশে তারা এসেছে। এ রাজ্য থেকে তারা অতি সহজেই তাদের অভিসন্ধি পূরণ করতে সক্ষম হবে।

বনহুর আর রহমানের ঝিন্দ আগমনের উদ্দেশ্যই মনিরাকে এবং তার সন্তানকে খুঁজে বের করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না বনহুরের মনে। মনিরাকে খুঁজে পেলেই তারা ফিরে যাবে নিজ আস্তানায়। সৎ মনোভাব নিয়েই বনহুর আর রহমান ঝিন্দের মহারাজ জয়সিন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল যাতে তাদের আগমনে ঝিন্দবাসীদের মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে।

কিন্তু প্রথম রাতেই বনহুর আর রহমান বুঝতে পারল তাদের এ আগমন যত সহজ ও স্বাভাবিক ভেবেছিল তা নয়। বিরাট একটা রহস্যজাল ছড়িয়ে রয়েছে এ রাজ্যের মধ্যে। কৌশলে এ রহস্য জাল তাকে গুটাতে হবে—এর গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে হবে।

বনহুরের শরীরের মাংসপেশীগুলো তার চিন্তাধারার সংগে সংগে স্ফীত হয়ে উঠলো। ধমনীর রক্ত হয়ে উঠল উষ্ণ। চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক ধক করে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল—নরপিশাচ মঙ্গলসিন্ধ তোমার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া হবে।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ শুধু অমানুষ নয়, সে একজন দুশ্চরিত্র এবং নারী হত্যাকারী।

বাকী রাতটুকু নানা চিন্তায় কাটল বনহুরের।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে বললো বনহুর—রহমান, তৈরি হয়ে নাও, বাইরে বের হব।

রহমান বলল— আমি প্রস্তুত সর্দার।

বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে বাগান বাড়ি থেকে বের হলো। রাজপথ ধরে হেঁটে চলল তারা।

মাত্র কিছুদূর এগিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি সাঁ করে চলে গেল তাদের পাশ কেটে। বনহুর দ্রুতহস্তে রহমানকে একটু পাশে ঠেলে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়িয়েছিল, নইলে তক্ষুণি তাদের চাপা দিয়ে চলে যেত গাড়িটা।

গাড়িখানা চলে যেতেই বনহুর হেসে বলল- রহমান, মৃত্যুর প্রথম আলিঙ্গন থেকে প্রথম মুক্তিলাভ।

তাইতো সদার, আর একটু হলেই গাড়িটা আমাদের চাপা দিয়েছিল আর কি—

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

বনহুর বলল—ভেবেছিলাম ঝিন্দে এসে নিশ্চিন্তে মনিরার সন্ধান করব কিন্তু তা হলো কই।

রহমান বলে উঠল—কে এই দুশমন, যে প্রথম দিনেই আমাদের পিছু লেগেছে?

অপেক্ষা কর রহমান, শিগ্‌গিরই জানতে পারবে।

এখন কোথায় চলছেন স্যার?

কোন একটা ভাল হোটেলে।

হোটেলে কেন, সর্দার, আমরা তো----

হ্যাঁ, মহারাজ জয়সিন্ধের অতিথিরূপে আমরা বেশ আরামেই আছি, কিন্তু আমাদের আর একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন, সেখানে আমরা ভীল সর্দার নই, সভ্য নাগরিক। রহমান, একটা কথা—যতক্ষণ আমাদের বজরা সিন্ধি নদী অতিক্রম করে ঝিন্দ শহরে পৌঁছতে সক্ষম না হয়েছে, ততক্ষণ আমাদের কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না।

গোটা দিনটাই বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশে ঝিন্দ শহরের অলিগলি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াল। মাঝে মাঝে কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টে উঠে কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিল।

সন্ধ্যার পূর্বে বাগানবাড়িতে ফিরে এলো তারা।

বাগানবাড়িতে প্রবেশ করতেই একটা নূপুরধ্বনি তাদের কানে এসে পৌঁছল।

বনহুর বলল—চলো রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষে যাই, একটু নাচগান দেখে আসি।

হ্যাঁ রহমান, এসো।

বনহুর আর রহমান মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল।

কক্ষে তখন পুরদমে নাচগান চলছে।

একদল মাতালের সঙ্গে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে আছে। সামনে কয়েকটা বোতল এবং কাঁচপাত্র।

বনহুর আর রহমানকে দেখতে পেয়ে মঙ্গলসিন্ধ সোজা হয়ে বসল, চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা বিদ্রুপভরা হাসির আভাস। মঙ্গলসিন্ধ তার বিশিষ্ট বন্ধু কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মৃদু করে কিছু বলল।

কঙ্করসিং উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বনহুর ও রহমানকে অভ্যর্থনা জানাল,—এসো এসো ভীল সর্দার, বস।

বনহুর আর রহমান একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। বনহুর এগিয়ে গিয়ে আসন গ্রহণ করল। রহমান তাকে অনুসরণ করল।

একটা নর্তকী তখন নেচে চলেছে।

একপাশে কয়েকজন বাদ্যকর বসে বাজনা বাজাচ্ছিল।

বনহুর আর রহমান বসলো ওপাশে ভিন্ন একটা জায়গায়।

নর্তকীর নাচ-গানে মুগ্ধ হলো বনহুর। সে আপন মনে নর্তকীর নাচ দেখতে লাগল। অপূর্ব, অদ্ভুত সে নাচ।

রহমানের চোখে যদিও নর্তকীর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তার দৃষ্টিছিল মঙ্গলসিন্ধের মুখে এবং কক্ষের সকলকেই সে দেখছিল।

মঙ্গলসিন্ধের ইঙ্গিতে একজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এটাও লক্ষ্য করল রহমান।

বনহুর আজ তন্ময় হয়ে গেছে ঝিন্দ নর্তকীর নাচ দেখে। নানারকম অঙ্গিভঙ্গি করে নেচে চলছে নর্তকীটি।

একটু পরে লোকটা ফিরে এলো, হাতে তার নতুন একটা মদের বোতল। কিন্তু রহমান সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করল, বোতলটা নতুন হলেও বোতলের ছিপি সম্পূর্ণ আলগা।

রাজকুমার জয়সিন্ধের ইঙ্গিতে বোতলটা কঙ্করসিংয়ের হাতে দিল লোকটা।

কঙ্কর সিং একটা কাঁচের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নর্তকীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

নর্তকী নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো কঙ্কর সিংয়ের নিকটে, নাচের ভঙ্গীমায় হাতখানা সে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

কঙ্কর সিং মদের পাত্রটা নর্তকীর হাতে দিয়ে তার কানে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল—দক্ষিণ ধারের ভীল সর্দারকে দাও।

নর্তকী মদের পাত্র হাতে নিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে সে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সম্মুখে মদের পাত্রটা

এগিয়ে ধরল। মঙ্গলসিন্ধ মদের পাত্র যেমনি হাত বাড়িয়ে নিতে গেল অমনি নর্তকী সুকৌশলে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ভীল সর্দার বেশি বনহুরের সম্মুখে। মদের পাত্রটা এগিয়ে ধরল তার দিকে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা হাতে নিতে গেল।

অমনি রহমান হাত বাড়িয়ে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা নিয়ে নিল হাতে।

কক্ষে সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল।

বনহুর অবাক হয়ে তাকাল রহমানের মুখের দিকে। হঠাৎ তার এ আচরণের জন্য বিস্মিত হলো সে।

রহমান মদের পাত্রটা হাতে নিয়ে নিজের মুখে দিতে গেল, অমনি হাত ফস্‌কে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাঁচের টুকরোগুলো খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উঠে দাঁড়াল।

বনহুর উঠে দাঁড়াতেই রহমানও উঠে পড়ল।

নর্তকী চকিতে একবার রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। সেও উঠে দাঁড়াল চট করে। তারপর বনহুরের দক্ষিণ বাহুর উপর মাথা রেখে বলল— তুম্ হারামা পিয়ার হো।

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল বাঁকা হাসির রেখা, বলল—তুমবি মেরা পেয়ার।

নর্তকী আর ঘনিষ্ঠভাবে বনহুরকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসেই বলল—ফির মোলাকাত হোকি। বনহুর বেরিয়ে গেল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যেতেই মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে বললো— দেখেছ?

কঙ্কর সিং ঠোঁট উল্‌টে অবজ্ঞাভরে বলল– দেখেছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল— কি মনে হলো?

অদ্ভুত চিজ বলে মনে হলো কুমার। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ বলে মনে হলো না।

আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে।

মনে হচ্ছে নয় কুমার, একেবারে বাগানবাড়িতে যাকে তাকে স্থান দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

এটা আমার বাবার দোষ। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। শুধু তাই নয় কঙ্কর, বাবা আজকাল রাজকোষ থেকে আমার ভাতার পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছে।

কি বললে, তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে তুমি বঞ্চিত। যাই বল কুমার, তুমি বলেই বুড়ো রাজাকে আজও তোয়াজ করে চলছ। কেন, রাজ্য চালাবার বয়স কি তোমার হয়নি?

কি করব বল, পিতা গুরুজন— কাজেই তিনি বেচে থাকা পর্যন্ত আমাকে এসব সহ্য করেই চলতে হবে। তাছাড়া আর একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কি সমস্যা কুমার?

বাগানবাড়িতে আমরা আমোদ-প্রমোদ করি, এ কথা তিনি জানতে পেরে আমার নিকটে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন।

কি জবাব দিয়েছ বন্ধু?

আমরা ক'জন বন্ধু-বান্ধব মিলে একটু গান-বাজনা করি, এটাই কি আপনার সহ্য হয় না, তাহলে আমি দেশ ত্যাগী হবো।

কি বললেন মহারাজ?

একমাত্র সন্তান আমি, দেশ ত্যাগী হলে চোখে অন্ধকার দেখবে, কাজেই বুঝতে পারছো.....

বেশ, বেশ বন্ধু.....

নর্তকী তখন দুটি কাঁচপাত্রে মদ ঢেলে এগিয়ে ধরে কুমার মঙ্গল সিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দিকে।

❑

কেঁদে কেঁদে মনিরার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সঙ্গী মেয়েদের অবস্থা তার মনে ভীষণ ভয় লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ তার কক্ষে একটা একটা করে অনেকগুলো মেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলের কি

মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে, সব দেখেছে মনিরা। এখন বাকী সে আর একটি মেয়ে—এ মেয়েটি সবচেয়ে বেশি কুৎসিত বলে তার জন্য গ্রাহক হয়নি, আর মনিরা সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাকেও কেউ কিনতে পারেনি। মনিরার মূল্য অন্যান্য যুবতীর তুলনায় চারগুণ বেশি—কাজেই মনিরা রয়েই গেছে।

কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সে অপেক্ষা করছে, কোন সময় তার অবস্থাও সঙ্গীনিদের মত হবে। তার সম্মুখেই কত মেয়েকে হাত-পা-মুখ বেধে চালান করা হলো। কতজনকে নানা রকম শাড়ি গয়না অলঙ্কারের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কতজনকে চাবুক মেরে আঘাতের পর আঘাত করে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মনিরা জানে, কোথায় তাদের পাঠানো হচ্ছে। কোথায় তারা চলে যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না আসতে পারে না।

অহরহ চোখের পানি আজ মনিরার সম্বল। আজ মনে পড়ে স্বামীর কথা—মনে পড়ে শিশু নূরের কথা। মনে পড়ে স্বামীর স্নেহময় আদর-যত্নের কথা।

প্রাণের মায়া মনিরার পূর্ব্ব থেকেই ছিল না, আজও সে করে না। শুধু চিন্তা ইজ্জতের। প্রদীপের ক্ষীণ আলোর মত একটা আশার স্বপ্ন এখনও মনিরার মনে জেগে রয়েছে। একদিন তার স্বামীর ভুল ভাঙবে—বুঝতে পারবে তার মনিরা সত্যি অসতী নয়। এ বিশ্বাস যেন তার অটুট থাকে, এটাই শুধু কামনা করে সে।

তাই মনে-প্রাণে সদা খোদাকে স্মরণ করে—হে দয়াময় খোদা, তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা কর। আমাকে তুমি পাপিষ্ঠদের হাতে থেকে বাঁচিয়ে নাও।

একদিন মনিরা গভীর রাতে বসে বসে নামায পড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বিশাল বপু মহিলাটি।

মনিরাকে নামায পড়তে দেখে রাগে বোমার মত ফেটে পড়ল। তখনই হাতে তালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে মত লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

লোক দুটি আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

বিশাল বপুধারিনী হেমাঙ্গিনী বললো—একে নিয়ে চলো।

মনিরা তখন নামায শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল হেমাঙ্গিনী আর ঐ জমকালো বেঁটে লোক দু'টির দিকে।

হেমাঙ্গিনী গর্জে উঠল–লিয়ে চল্ বেটারা, হা করে কি দেখছিস্।

মনিরার দেহে প্রাণ নেই যে, অন্যান্য যুবতীর মর্মবিদারক দৃশ্যগুলো তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বুঝতে পারল আজ তার পালা, এই বুঝি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

বেঁটে লোক দুটি মনিরাকে তখন এঁটে ধরে ফেলেছে। সেকি ভীষণ শক্তি তাদের দেহে। যেন অসুরের বল।

মনিরাকে যখন লোক দুটি জোর করে ধরলো তখন মনিরার সঙ্গিনী সেই কুৎসিত মেয়েটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ছুটে গিয়ে ওদের দু জনকে ছাড়িয়ে দিতে গেল।

সেই সময় হেমাঙ্গিনী হাতের বেত দিয়ে সপাং করে একটা আঘাত করল মেয়েটার শরীরে।

আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা।

হেমাঙ্গিনী প্রচণ্ড এ ধাক্কায় ফেলে দিল ওকে মেঝেতে।

এবার মনিরাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলল বেঁটে লোক দু'টি।

হেমাঙ্গিনী চলল সবার আগে।

কোথা দিয়ে কোথায় যে তাকে নিয়ে এলো মনিরা বুঝতেই পারল না। একটা মস্তবড় সুসজ্জিত কক্ষ। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। মনিরাকে সেই কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো চলে গেল—সামনে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী।

কক্ষের ভিতরে ঢুকতেই শিউরে উঠল। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, চোখেমুখে তার লালসাপূর্ণ কুৎসিত চাহনি—হেমাঙ্গিনী বলে উঠল--- এই সেই মেয়ে দেখুন।

লোকটা মনিরাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—খাসা চেহারা, কিন্তু-----

আর কিন্তু নয়, দেখুন যদি পছন্দ হয় তবে ঐ পুরোপুরিই দিতে হবে।

তা টাকার জন্য বাধবে না, যা চাও পাবে।

পছন্দ তাহলে হয়েছে?

চমৎকার চেহারা!

হ্যাঁ, হাজারে এমন একটা পাওয়া মুশকিল—বলল হেমাঙ্গিনী।

লোকটা এগিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর কানে কানে কি যেন বলল, তারপর একতোড়া নোট হেমাঙ্গিনীর হাতে গুঁজে দিল।

হেমাঙ্গিনী একটু হেসে বেরিয়ে গেল।

মনিরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। হায়; এ মুহূর্তে তাকে কে বাঁচাবে, কে তাকে রক্ষা করবে! মনিরা লোকটার দিকে তাকাল। আর একদিন সে এমনি অবস্থায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত খুন করতে বাধ্য হয়েছিল সে; কিন্তু আজ সে কি উপায়ে নিজেকে রক্ষা করবে, কোথায় লুকাবে—

লোকটা লালসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছে।

মনিরা তাকাল দরজার দিকে, দরজা ভেজানো।

ওদিকের টেবিলে কয়েকটা মদের বোতল সাজানো। আর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস।

মনিরা একবার বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিল।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি ভয়ংকর তার চেহারা! লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে, পা দু'খানা ওর টলছে।

লোকটা যতই এগিয়ে আসছে, মনিরা ততই ঐ টেবিলটার দিকে এগুচ্ছে, যে টেবিলে সাজানো রয়েছে কয়েকটা মদের বোতল।

হঠাৎ মনিরা ছুটে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিল হাতের মুঠায়।

মাতালটা তখনও দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে!

মনিরা বোতলটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। মনিরার নিক্ষিপ্ত বোতলটা লোকটার মাথায় লেগে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

লোকটার মাথা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

মনিরা দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাথায় আহত জায়গাটা চেপে ধরে লোকটাও ছুটলো পিছু পিছু।

মনিরা কিছুদূর এগুতেই দেখল সামনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী; খপ্ করে ধরে ফেলল সে মনিরাকে!

ততক্ষণে মনিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে শয়তান মাতালটা। তার সমস্ত শরীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

হেমাঙ্গিনী ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠল। একবার নয়, দু'বার তার পাওয়া টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল। রাগে মনিরার গলাটা দু'হাতে টিপে ধরলো, দাঁতে দাঁত পিষে বলল— তোকে খুন করব!

লোকটা বলে উঠল—আগে আমার টাকা ফেরত দাও, তারপর ওকে যা খুশি কর!

হেমাঙ্গিনী এবারও বাধ্য হলো লোকটার টাকা ফেরত দিতে।

হেমাঙ্গিনী লোকটার টাকা ফেরত দিয়ে পুনরায় মনিরার গলা টিপে ধরলো। নিশ্চয়ই এবার ওকে হত্যা না করে ছাড়বে না। জোরে, খুব জোরে চাপ দিচ্ছে, মনিরার চোখ দুটো কপালে উঠেছে, এবার হয়তো তার জীবন শেষ!

হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গাদা গাদা টাকার বাণ্ডিল। মনিরাকে হত্যা করলে এতগুলো টাকা তার বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে! হেমাঙ্গিনীর হাত দু'খানা আপনা আপনি শিথিল হয়ে এলো। মনিরাকে ছেড়ে দিল সে।

এরপর থেকে শুরু হলো মনিরার ওপর নির্মম অত্যাচার। প্রতিদিন তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে পঁচিশ ঘা বেত মারা হতে লাগল, আর জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, সে ও-রকম কাজ আর করবে কি না। কিন্তু মনিরা পঁচিশ ঘা বেত খেয়েও বলত—সে ও-কাজ করবে।

হেমাঙ্গিনীর কড়া আদেশ, যতদিন মনিরা স্বীকার না করবে বা রাজী না হবে ততদিন এভাবে বেত্রাঘাত করা হবে।

রোজ মনিরার ওপর এই অকথ্য অত্যাচার চলতে লাগল।

ইতোমধ্যে আরও চারজন যুবতী পাকড়াও করে আনা হয়েছে। পূর্বের শূন্যতা আবার পূর্ণ হয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য! সব মেয়েই কাঁদছে, মাথা কুটে কাঁদছে। সবাই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে কন্যা-বধু।

আজকাল হেমাঙ্গিনীর ব্যবসা আরও ফেঁপে উঠেছে। শুধু নারী ব্যবসাই নয়, শিশু ব্যবসাও সে শুরু করেছে! বিভিন্ন দেশে তার অনুচর ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে যা সুবিধা করতে পারে সে তাই করছে। ছোট ছোট মেয়েকে চালান দেওয়া হয় এ দেশ থেকে সে দেশে।

নারীদেরও সেই অবস্থা!

হেমাঙ্গিনীর সহকারিগণের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। ব্যবসা চলছে পুরাদমে।

❑

অশ্বপৃষ্ঠে দস্যু বনহুর আর রহমান ঝিন্দ শহরের শেষ সীমান্তে ভাগিন্দী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। তাদের বজরা আজ পৌঁছে গেছে। বনহুর আর রহমান নিজেদের বজরায় এসে উপস্থিত হলো।

বনহুর নিজের অনুচরগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। পথে তাদের কোন অসুবিধা বা কোন বিপদ এসেছিল কিনা তাও জেনে নিল।

না, কোন অসুবিধা বা বিপদের সম্মুখীন হয়নি তার অনুচরগণ। বনহুর আশ্বস্ত হলো।

বনহুর বজরায় প্রবেশ করে নিজের গোপন অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে নিল।

বনহুর আর রহমান যখন বজরা থেকে ফিরে এলো তখনও তাদের শরীরে পূর্বের সেই ভীল সর্দারের ড্রেস। বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করল তারা।

বনহুর আর রহমান একই কক্ষে ঘুমাতো।

সেদিন বাইরে থেকে ফিরতেই একজন রাজকর্মচারী বলল– ভীল সর্দার, আপনাদের কুমার মঙ্গলসিন্ধ পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন।

রহমান অবাক কণ্ঠে বলল—কেন?

রাজকর্মচারী বলল—আপনাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কারণে এরকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

রহমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বনহুর বাধা দিয়ে বলল– তোমাদের কুমার বাহাদুরকে আমার ধন্যবাদ জানাবে। তার এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

রাজকর্মচারী চলে গেল।

রহমান তাকাল বনহুরের দিকে—সর্দার!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—যাও রহমান, তোমার নিজ বিশ্রাম-কক্ষে যাও।

রহমান কোনদিন তাদের সর্দারের কথার প্রতিবাদ করেনি। আজও সে পারল না, চলে গেল তার নিজের বিশ্রামকক্ষে। যদিও রহমান নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল, কিন্তু মন তার সদা আশঙ্কাগ্রস্ত রইলো। নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে।

বনহুরও নিজের কক্ষে প্রবেশ করল।

অন্যদিন হলে বনহুর তার ভীল সর্দারের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে শয্যা গ্রহণ করত। আজ সে ঐ বেশে শয্যায় গিয়ে বসল। একটা নতুন কোন কিছুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুর বিছানায় শুয়ে নিশ্চুপ চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

পাশের ঘরে রহমানও বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে, আর মাঝে মাঝে উঠে নিজের জানালা দিয়ে সর্দারের কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

রহমান যে কক্ষে শুয়েছে সে কক্ষের জানালা দিয়ে বনহুরের কক্ষের কিছুটা অংশ দেখা যায়। বিশেষ করে বনহুরের শয্যার কিছুটা ওর নজরে পড়ে। রহমান আজ সর্দারকে ছদ্মবেশ পরিবর্তন না করেই শয্যা গ্রহণ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। তারপর বুঝে নিয়েছিল নিশ্চয়ই সর্দার এই বেশেই রাত্রিতে বের হয়। সে কারণে সেও ঘুমাতে পারেনি, সর্দার যদি বাইরে বের হয় তবে রহমানও চুপ করে শুয়ে থাকবে না, এটাই ছিল তার মনোভাব এবং সে কারণেই রহমান বারবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছিল কি করছে তার সর্দার।

প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলেছে।

রোজই বাগানবাড়ির ওপাশ থেকে ভেসে আসে নর্তকীর পায়ের নূপুরের শব্দের সঙ্গে নানা কণ্ঠের হাস্যধ্বনি আর করতালি। আজ কিন্তু বাগানবাড়ি বেশ নীরব রয়েছে। কুমার মঙ্গলসিন্ধ কোথাও গেছে হয়ত, তাই আজ বাগানবাড়ি এমন নিশ্চুপ।

রহমান কখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে খেয়াল নেই ওর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার, একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। সর্দারের কক্ষ

থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। রহমান চট করে শয্যা ত্যাগ করে জানালার শার্সীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চমকে উঠল রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষের নর্তকী তার সর্দারের পাশে বসে, সর্দারের দক্ষিণ হাতখানা নর্তকীর মুঠায় ধরা রয়েছে। আবেগভরা কণ্ঠে কি যেন বলছে নর্তকী। ওর গলায় আওয়াজ শুনা যাচ্ছে কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে না।

নর্তকী বনহুরের কাঁধে মাথা রাখল।

বনহুর কি যেন বলছে, ঠিক বুঝা না গেলেও এটুকু শুনতে পেল রহমান, তুমহারে লিয়ে মাইভি বহুৎ পেরেশান... এরপর আর কিছুই বোঝা গেল না।

নর্তকী বাহু দু'টি দিয়ে সর্দারের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছে।

রহমান আর দাঁড়াতে পারল না—একটা লজ্জা তাকে সরিয়ে নিল জানালা থেকে।

সর্দারের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তবে কি সর্দার ভুলে গেল তার কর্তব্য! একটা নারীর মোহ তাকে অভিভূত করে ফেললো! রহমানের মনে গভীর একটা অভিমান চাড়া দিয়ে উঠল!

নিজের শয্যায় পুনরায় শুয়ে পড়ল। এ কারণেই বুঝি মঙ্গলসিন্ধ সর্দারকে ভিন্ন কামরায় শোবার ব্যবস্থা করেছিল। রহমানের মনে পড়ল, সেদিন রাতে নর্তকী যে মদের পাত্র তার সর্দারের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরেছিল তার মধ্যে মেশানো ছিল হয়ত মারাত্মক বিষ। আজও নর্তকী কোন মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে তার সর্দারের নিকটে এসেছে, এটা সত্য। রহমান আবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে দাঁড়াল সেই জানালার পাশে।

একি, সর্দার আর নর্তকী দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর আর নর্তকীর পেছনে দাঁড়াল, বলল—সর্দার!

চমকে ফিরে দাঁড়াল বনহুর।

নর্তকী আরও বেশি চমকে উঠলো, বাগানবাড়ির অন্ধকারে তাকাল সে রহমানের মুখের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারল, রহমান তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করছে। একটু হেসে বলল—এক্ষুণ আসছি রহমান, একে একটু পৌঁছে দিয়ে আসি।

সর্দার, আমিই তো রয়েছি। এসো—নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল রহমান।

অগত্যা নর্তকী রহমানের সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো।

বনহুর ফিরে এলো নিজের কামরায়।

মঙ্গলসিন্ধ পায়চারী করছে, চোখে তার ক্রুদ্ধ ভাব।

কঙ্কর সিং একপাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরাটা সে হাতের মধ্যে নাড়ছে। বিদ্যুতের আলোতে ঝক্‌ঝক উঠছে ছোরাটা।

সামনে নর্তকীটি, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মঙ্গলসিন্ধ গর্জন করে উঠল—এটুকুই তুমি পারলে না সিমকী। তোমাকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।

নর্তকী সিমকী হাত জুড়ে বলল—মেরী কোই কসুর নেহি কুমার বাহাদুর। ও তো মেরী সাথ আতে থে। লেকিন উসকা সাথ যো আদমী হ্যায় ও সব কুছ বরবাদ কিয়া.....

কঙ্কর রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠল—কুমার, আজ সুযোগ নষ্ট হলো, এরপর যেন না হয়।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিই তো আমার ভরসা কঙ্কর!

তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ভীল সর্দারের তাজা রক্ত আমি নিঃশেষ করে দেব।

মঙ্গলসিন্ধ এবার বলল–হাঁ, ঐ লোক দু'টিই যেন আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল সে– তুমি এখন যেতে পার সিমকী।

সিমকী সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়র মধ্যে শুরু হলো গোপন আলোচনা। ভীল সর্দারদ্বয়কে কি করে তাড়ানো যায়, এ নিয়ে চলল তাদের নানারকম পরামর্শ।

প্রথম থেকেই মঙ্গলসিন্ধের চক্ষুশূল হয়ে এসেছে এই ভীল সর্দারদ্বয়।

এদের চালচলন আর কথাবার্তা মঙ্গলসিন্ধের মনে সৃষ্টি করছে একটা বিষকর জ্বালা। সামান্য ভীল সর্দার হয়ে প্রথম দিনই তার কথা অমান্য করেছে—এ কম অপরাধ নয়! তাছাড়া ভীল সর্দারের অপরূপ সৌন্দর্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করছে।

এদের আগমনে মঙ্গলসিন্ধ আর তার বন্ধু কঙ্করসিং মোটেই খুশি হতে পারেনি। বাগানবাড়িতে তারা যা খুশি তাই করে যাচ্ছিল—তাদের কাজে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভীল সর্দার দু'জন, ইচ্ছামত তাদের বাসনা সিদ্ধ হচ্ছে না এখন।

❑

সেদিন দ্বিপ্রহরে নদীতীরে কয়েকজন যুবতী আপন মনে স্নান করছিল। কেউ সাঁতার কাটছিল, কেউ বা গুণ গুণ করে গান গাইছিল। কেউ হাত নেড়ে নদীর পানি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো আর একজন যুবতীর গায়ে।

এমন সময় মঙ্গলসিন্ধ ও তার বন্ধু কঙ্কর সিং দু'জন দুটি অশ্বে নদীর তীর গিয়ে দাঁড়াল।

যুবতীগণ নদীবক্ষে আপন মনে সাঁতার কাটলেও তারা দেখতে পেল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংকে। তাড়াতাড়ি ওরা নিজেদের কাপড় সংযত করে নিয়ে ঘাটের পাড়ে এসে দাঁড়াল। ভয়-বিহবল আর সঙ্কুচিতভাবে যুবতীগণ এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মধ্যে ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

কঙ্কর সিং চট করে অশ্ব থেকে নেমে এগিয়ে গেল যুবতীদের দিকে।

যুবতীরা তখন সবাই এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মঙ্গলসিন্ধ আংগুল দিয়ে একটা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে দিল।

কঙ্কর সিং খপ্ করে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল মঙ্গলসিন্ধের অশ্বের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। একসঙ্গে সবাই বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আর রহমান অদূরস্থ একটা পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিল। যুবতীদের আর্তনাদ তাদের কানে এসে পৌঁছল।

রহমান বলে উঠল—সর্দার, নিশ্চয়ই নদীতীরে যুবতীর দল স্নান করছিল, হয়তো কুমীরে কাউকে নিয়ে গেছে.....

বনহুর বলে উঠল—চলো দেখি!

বনহুর আর রহমান দ্রুত ছুটে গেল নদীতীরে। কিন্তু নদীতীরে পৌঁছে বিস্ময়ে চমকে উঠলো, রহমান আর বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক্ করে। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল; দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্টে বসে একটা যুবতীর দক্ষিণ হাত টেনে ধরেছে আর কঙ্কর সিং যুবতীটিকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। যুবতীটি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

আর অন্যান্য যুবতী আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও— বাঁচাও.....

বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কর সিংয়ের ওপর। প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর নাকে। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কর সিং মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে আগুন ঠিকরে বের হতে লাগল। মুখের শিকার নষ্ট হলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে হিংস্র বাঘ, ঠিক তেমনি হলো তার অবস্থা।

যুবতীটি ছাড়া পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

কঙ্কর সিং এবার গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোন কথা বলার সাহস হলো না তার।

মঙ্গলসিন্ধ রাগে গজগজ করছে, কিন্তু সেও কিছু উচ্চারণ করল না।

মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্ঠে ছিল।

কঙ্কর সিং এবার নিজের অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল, একবার তীব্র কটাক্ষে বনহুর আর রহমানের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং।

বনহুর আর রহমান এবার যুবতীটির দিকে তাকাল।

সেই যুবতীটিও তখন নিজের দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে, কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

বনহুর আর রহমান নিজেদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

রাজসভায় মহারাজ জয়সিন্ধ বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন—সেখানে উপবিষ্ঠ রাজ-পরিষদগণ! এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী এবং তার বৃদ্ধ পিতা রাজসভায় এসে হাজির হলো।

প্রথমে বাধা দিচ্ছিল রাজকর্ম চারিগণ।

রাজা আদেশ দিলেন— আসতে দাও।

যুবতী এবং তার পিতা এসে হাত জুড়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, একি অন্যায় অত্যাচার। বিচার করুন মহারাজ, বিচার করুন....

মহারাজ চিরদিনই প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। বৃদ্ধের চোখের পানি তাঁর অন্তরে আঘাত করল, বললেন—কে তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছে, বল?

বৃদ্ধ পুনরায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—মহারাজ, যদি অভয় দেন তবে বলতে পারি।

মহারাজ জয়সিন্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান রাজা, এ কথায় তিনি বৃদ্ধাকে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

বৃদ্ধ হাত জুড়ে বিনীত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমার কন্যা এবং তার কয়েকজন সঙ্গিনী নদীতে স্নান করছিল। এমন সময়— বৃদ্ধ ভয়বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগল চারদিকে, এমন সময়—আপনার—থেমে পড়ল বৃদ্ধ।

মহারাজ জয়সিন্ধ বললেন—বল, কি বলতে চাও তুমি?

মহারাজ, আপনার পুত্র ও তার বন্ধু কঙ্কর নদীতীরে পৌঁছে আমার কন্যাকে জোরপূর্বক হরণ করার চেষ্টা করছিল—

ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠলেন রাজা জয়সিন্ধ—এ কথা সত্য?

এবার যুবতী বলে উঠল—হাঁ, মহারাজ এ কথা সত্য। সেই মুহূর্তে দু'জন ভীল সর্দার সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

মহারাজ জয়সিন্ধ বলে উঠলেন—কে সেই মহান ভীল সর্দারদ্বয়?

বৃদ্ধ বলে উঠল—তারা আপনার অতিথি ভীল সর্দারদ্বয়।

মহারাজার চোখেমুখে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। তার মহান অতিথিদ্বয়ের মহৎ উপকারের জন্য হৃদয়ে গর্ব অনুভব করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সেনাপতি গুপ্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেন—সেনাপতি, এক্ষণি মঙ্গল ও তার বন্ধু কঙ্করকে ডাকুন, আমি এর বিচার করব। আর শুনুন, বাগানবাড়ি থেকে আমার ভীল অতিথিদ্বয়কে ডেকে আনবেন।

সেনাপতি তখনই বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং সহ সেনাপতি গুপ্তসেন ফিরে এলেন। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল বনহুর আর রহমান।

ভীল সর্দারের বেশে বনহুরকে বড় সুন্দর লাগছিল। মাথায় পালকের মুকুট, বাজু এবং গলায় কাল ফিতার চওড়া তাবিজ বাঁধা, কানে বালা, হাতেও বালা। পিঠের সঙ্গে তীরধনু বাঁধা রয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মুখ শুকিয়ে চুন হলো, যখন তারা দেখল–মহারাজার সামনে দণ্ডায়মান নদীতীরের সেই যুবতীটি ও তার পিতা। বুঝতে কিছু বাকী থাকে না তাদের। সকলের অলক্ষ্যে একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল ওরা দু'জনে।

মহারাজ জয়সিন্ধ পুত্র এবং তার বন্ধু কঙ্কর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন—এ কথা সত্য? তোমরা এই যুবতীটিকে হরণের চেষ্টা করেছিলে?

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কথায় ফিরে তাকাল যুবতীর দিকে, তারপর একটা ঢোক গিলে বলল—ওকে চিনি না।

বনহুর এগিয়ে এলো, গম্ভীর কণ্ঠে বলল—মিথ্যে কথা! কাল নদীতীরে এই যুবতীকে এরা দু'জনে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল মহারাজ। আংগুল দিয়ে মঙ্গল ও কঙ্করকে দেখিয়ে দিল বনহুর।

ক্রুদ্ধভাবে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল মঙ্গলসন্ধি, কঙ্কর সিংও সকলের অলক্ষ্যে দাঁতে দাঁত পিষল। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল বনহুরের ওপর।

মহারাজ বলে ওঠেন—নারীহরণের চেষ্টার জন্য আমি তোমাদের দু'জনকে শাস্তি দিচ্ছি। তোমরা দু'জন এই রাজসভায় নাকে কানে খৎ দিয়ে বল, আর অমন কাজ করবে না।!

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো মঙ্গল ও কঙ্কর রাজসভায় দাঁড়িয়ে নাকে কানে খৎ দিতে।

রাগে-অপমানে মঙ্গলসিন্ধের মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠল, এর চেয়ে তার পিতা যদি তাদের হত্যার আদেশ দিতেন তাতেও দুঃখ ছিল না। প্রকাশ্য রাজসভায় এতগুলো লোকের সামনে এই অপমান মঙ্গলসিন্ধ আর কংকর সিংয়ের মনে আগুন জ্বেলে দিল।

মহারাজ জয়সিন্ধ নিজের কণ্ঠ থেকে মহামূল্য হার খুলে পরিয়ে দিলেন ভীল সর্দারবেশী দস্যু বনহুরের কণ্ঠে। তারপর বললেন— আমার রাজ্যে মা-

বোনদের প্রতি যারা অন্যায় আচরণ করে তাদের আমি চরম শাস্তি দিয়ে থাকি, আর যারা তাদের মর্যাদা দেয় তাদের আমি করি শ্রদ্ধা।

মহারাজের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার অবহেলা করতে পারল না বনহুর, মহারাজার হাত চুম্বন করে আনন্দ প্রকাশ করলো সে।

এ দৃশ্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের হৃদয়ে কষাঘাত করল। একটা প্রচণ্ড ঈর্ষার আগুন দগ্ধীভূত করে চলল তাকে!

এরপর মঙ্গল এবং কঙ্কর নতমস্তকে রাজসভা ত্যাগ করল।

❑

রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর আর রহমান। আপন মনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল তারা। বনহুর আর রহমানের পেছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে যুবতী ও তার বৃদ্ধ পিতা।

রাজবাড়ি ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ ও সেই সঙ্গে আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল বনহুর আর রহমান। একি! পথের বুকে মুখে থুবড়ে পড়ে গেছে যুবতীর পিতা বৃদ্ধ চাষী।

বনহুর আর রহমান দ্রুত এগিয়ে গেল, নিকটে পৌঁছে বিস্ময়ে হতবাক হলো। বৃদ্ধের বুকে একট গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে পথের খানিকটা অংশ।

বনহুর বলে ওঠে—মঙ্গলসিন্ধ তার অপমানের প্রতিশোধ নিল।

রহমান বললো—সর্দার, একি তাহলে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধের কাজ?

হ্যাঁ রহমান, এটা তারই কাজ।

যুবতী তখন পিতার বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে।

অল্পক্ষণেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল সেখানে। কিন্তু সেই অজ্ঞাত খুনীর সন্ধান কেউ পেল না।

বাগানবাড়ি। মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষ।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং পাশাপাশি আসনে উপবিষ্ট। সামনে দু'জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দণ্ডায়মান। ভয়ংকর চেহারা, বলিষ্ঠ মাংসপেশী।

লাল টকটকে চোখ দুটো। পরনে টানাডোরা কাটা জামা ও খাকী হাফ প্যান্ট। মাথায় এক আংগুল লম্বা ছাঁটা চুল। দেখলেই মনে হয় শয়তানের সহোদর।

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—এ অপমানের প্রতিশোধ আমি চাই। প্রকাশ্য রাজদরবারে আমাকে অপমান! কিছুতেই আমি বরদাশ্‌ত করতে পারব না।

কঙ্কর সিং বলে ওঠে—সমস্ত দোষ ঐ শয়তান ভীল সর্দারটার। ওর জন্যই তো এ অপমান!

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—যেমন করে হোক ঐ ভীল সর্দারের মাথা আমি নেব। নইলে আমার নাম মঙ্গলসিন্ধ নয়।

এবার গুণ্ডালোক দুটিকে দেখিয়ে বলল কঙ্কর—এদের আদেশ করো মঙ্গল, এরাই তোমার কার্য সিদ্ধ করে দেবে, চাই শুধু টাকা!

গুণ্ডাদের মধ্যে বেশি মোটা লোকটা বলে উঠল—হুজুর, শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি, হুকুম করুন এখনই ভীল সর্দারের মাথা এনে দিচ্ছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কত টাকা নেবে তোমরা?

গুণ্ডাদের হয়ে জবাব দিল কঙ্কর—বেশি না, পাঁচ হাজার দিও।

পাঁচ হাজার, তার চেয়েও বেশি দেব কঙ্কর, তবু ওদের মাথা চাই!

কঙ্কর গুণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে একটা ইংগিত করল।

এবার গুণ্ডা লোকটা বলে উঠল—হুজুর, কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে, গরীব মানুষ আমরা—

বেশ এই নাও, এতে এক হাজার টাকা আছে। মঙ্গলসিন্ধ পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে লোকটার হাতে দিল।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল এবার।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, বুড়ো বাবা টাকা-পয়সার দিকে এবার কড়া নজর দিয়েছে। সিন্দুকের চাবি এখন তিনি নিজের কাছে রাখেন।

কঙ্কর হেসে উঠল—এই কথা? আচ্ছা তোমাকে একটা বুদ্ধি ঠাওরে দিচ্ছি।

কঙ্কর মঙ্গলসিন্ধের কানে মুখে নিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল। মঙ্গলসিন্ধের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

❑

গভীর রাত।

রাজপ্রাসাদের পেছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দোতলার দিকে এগুচ্ছে। মহারাজ জয়সিন্ধের কক্ষের জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল ছায়ামূর্তি, এবার মহারাজ জয়সিন্ধের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাকালো চারদিকে, তারপর অতি লুঘু হাতে সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা তুলে নিল।

এবার ছায়ামুর্তি সিন্দুকের পাশে দাঁড়াল। চাবি দিয়ে খুলে ফেলল সিন্দুকের তালা। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক তোড়া নোট তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল সামনের দিকে।

অমনি ছায়ামূর্তির সামনে একটা জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, অন্ধকারেও তার হাতের অস্ত্রটা চক্‌চক্ করে উঠল।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছায়ামূর্তি, দু'চোখে তার ভয় ও বিস্ময়। অন্ধকার হলেও চিনতে বাকী রইলো না জমকালো মূর্তির হাতে রয়েছে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

জমকালো মূর্তি ছোরাখানা ছায়ামূর্তির বুকে চেপে ধরে বাম হাত মেলে ধরল।

ছায়ামূর্তি যেমন নীরবে টাকার তোড়াগুলো পকেটে রেখেছিল, তেমনি নীরবে বের করে দিল জমকাল মূর্তির হাতে।

জমকালো মূর্তি টাকা নিয়ে নিমেষে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি কিছুক্ষণ থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দ্রুত পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে চলল।

রাজ প্রাসাদের বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ছায়ামূর্তি সেই গাড়িতে চেপে বসল।

গাড়ি অদৃশ্য হতেই, সেখানে এসে দাঁড়াল জমকালো মূর্তি। অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল সে—হাঃ হাঃ হঃ—হাঃ হাঃ হাঃ–

❑

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করছে মঙ্গলসিন্ধ।

একপাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে কঙ্করসিং। ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল কঙ্করসিং—কার এত সাহস যে তোমার বুকে ছোরা ধরে টাকাগুলো আত্মসাৎ করে নিল।

মঙ্গলসিন্ধ এবার দাঁড়াল, দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে বলল—সে যেই হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

এমন সময় মহারাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী বঙ্কু রায় এবং নতুন কর্মচারী বিনয় সেন এসে কুর্ণিশ জানাল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধকে।

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কর্মচারীদ্বয়কে এ অসময়ে এখানে দেখে একটু অবাক হবার ভান করে বলল—কি সংবাদ বঙ্কু রায়?

রাজকুমার, খুব দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ!

হ্যাঁ রাজকুমার, দুঃসংবাদ। আজ রাতে রাজকক্ষ থেকে এক লাখের বেশি টাকা চুরি হয়ে গেছে।

মিছামিছি চমকে ওঠার ভান করে মঙ্গলসিন্ধ একবার বাঁকা চোখে কঙ্কর সিংয়ের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বলে উঠল—রাজকক্ষে চুরি! বল কি বঙ্কু রায়?

হ্যাঁ কুমার, মহারাজ যখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে এই চুরি হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠল মঙ্গলসিন্ধ—আশ্চর্য! এবার চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠল তার, দাঁতে দাঁত পিষে বলল..... কে এই দুর্দান্ত বদমাইস যে ছোরা দেখিয়ে.....

আপনি ভুল করছেন কুমার, ছোরা দেখিয়ে নয়.....

হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছি....তা আমাকে কেন মহারাজ স্মরণ করেছেন বুঝতে পারছি না।

এবার নতুন কর্মচারী বিনয় সেন বলে উঠল—মহারাজ এতগুলো অর্থ হারিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। পুত্রসঙ্গ তাঁর মনে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা যোগাবে।

মঙ্গলসিন্ধ নতুন কর্মচারীটির মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বঙ্কু রায় বলল—কুমার, ইনি রাজবাড়ির নতুন কর্মচারী, নাম বিনয় সেন।

বিনয় সেন বিনীতভাবে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল।

মঙ্গলসিন্ধ তীক্ষ্ণ দৃ'ষ্টি নিক্ষেপ করে বিনয় সেনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। সৌম্য সুন্দর সুপুরুষ যুবক বিনয় সেন! মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। গভীর নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ। দীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডল। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ, শরীরে রাজকীয় পোশাক!

মঙ্গলসিন্ধ যখন বিনয় সেনকে লক্ষ্য করছিল তখন সে মৃদু মৃদু হাসছিল, অতি স্বাভাবিক সুন্দর সে হাসি!

মঙ্গলসিন্ধের ভাল লাগল যুবক বিনয় সেনকে। এবার সে বঙ্কু রায়কে বলল—যাও তোমরা। আমি আসছি!

বিদায় গ্রহণকালে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল বঙ্কু রায় ও বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে বল—সবতো শুনলে কঙ্কর? পিতা আমাকেই হয়তো সন্দেহ করে বসেছেন। নইলে তার কক্ষে প্রবেশের সাহস কার আছে!

কঙ্কর সিং বলল—মিথ্যা ভয়ে ভীত হচ্ছ মঙ্গল! তুমি সরল ভাব নিয়ে যাও সেখানে, তুমি যেন কিছুই জান না এভাবে কথাবার্তা বলবে।

আমার গলাটা কেঁপে যাবে না তো!

এত দুর্বল মন তোমার! রাজকুমার হয়ে এত ভীতু তুমি! সত্যি টাকাটা তো আর তুমি নাওনি।

কিন্তু.....

আর কিন্তু নয় মঙ্গল, যাও।

মঙ্গলসিন্ধ বেরিয়ে গেল।

মহারাজার বিশ্রামকক্ষ।

সিন্দুক থেকে একসঙ্গে এতগুলো টাকা চুরি কম কথা নয়। তাছাড়া রাজকক্ষ থেকে চুরি! মহারাজ জয়সিন্ধ উত্তেজিতভাবে পায়চারী করে চলেছেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচরগণ, এমনকি মন্ত্রী সেনাপতি পরিষদ সবাই দণ্ডায়মান। বঙ্কু রায় ও বিনয় সেনও রয়েছে সেখানে। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার কক্ষে প্রবেশ করে এমন লোক কে আছে রাজ্যে?

সেনাপতি বলে উঠলেন—এত পাহারা সত্ত্বেও চোর স্বচ্ছন্দে এসেছিল এবং কার্যোদ্ধার করে সরে পড়েছে।

এমন সময় রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ রাজকক্ষে প্রবেশ করে পিতাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—একি সংবাদ শুনলাম বাবা!

মহারাজ গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—মংগল, যা শুনেছ তা যতখানি দুঃখের তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, আমার রাজ্যে কে এমন আছে যে আমার কক্ষে প্রবেশে সক্ষম হলো?

এ কথা আমিও ভাবছি।

ভাবছি নয়, তাকে তোমাদের আবিষ্কার করতে হবে! এবং সে কারণেই তোমাকে ডেকেছি।

মঙ্গলসিন্ধু বলে উঠল—বাবা, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি শপথ করছি কে এই লোক তাকে খুঁজে বের করবোই।

মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল বিনয় সেন—কুমার, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকালো বিনয় সেনের দিকে। তার সংগে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

❑

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দক্ষিণ হাত হয়ে উঠল বিনয় সেন। সব সময় মঙ্গলসিন্ধের পাশে পাশে থাকে সে।

গোপনে নানা সংবাদ সরবরাহ করে।

বিনয় সেনের সহযোগিতায় মঙ্গলসিন্ধ উপকৃত হলো। কৌশলে বিনয় সেন মহারাজাকে বশীভূত করে আরও অর্থ মঙ্গল সেনের হস্তগত করে নিল। এতে আনন্দের সীমা রইলো না মঙ্গলসিন্ধের।

এখন যত গোপন পরামর্শ হয়, সব সময়ে তাদের দলে থাকে বিনয় সেন।

সেদিন বাগানবাড়ির গোপন কক্ষে আলোচনা হচ্ছিল। মঙ্গলসিন্ধ, কঙ্করসিং আর পূর্বের সেই শয়তান গুণ্ডালোক দু'টি এবং বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ গুণ্ডালোক দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল—আজও তোমরা ঐ ভীল সর্দার দু'জনকে তাড়াতে পারলে না, অকেজো কোথাকার!

গুণ্ডা লোক দু'টি হাতজোড় করে বলল—কুমার, আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি না, কিন্তু আজও তাদের...

এতগুলো টাকা খেলে তবু কাজ হাসিল করতে পারলে না। অসমর্থ, অক্ষম—আমার টাকা ফেরত দাও।

বিনীত কণ্ঠে গুণ্ডাদের নেতা লোকটা বলল—আর দুটো দিন আমাদের সময় দেন কুমার বাহাদুর!

বেশ দিলাম এরপর আর ক্ষমা করবো না।

কঙ্করসিং মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল—একেবারে খতম করে দিতে পারলে মোটা বখশীস মিলবে।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর। সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়। বিনয় সেন হেসে বলল—কুমার বাহাদুর, ভীল সর্দার দুটিকে যতক্ষণ না তাড়িয়েছেন ততক্ষণ আপনারা নিশ্চিন্ত নন।

হ্যাঁ বিনয়, তোমার কথা সত্য।

❑

সন্ধ্যা থেকে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তৎসঙ্গে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা পৃথিবীটা যেন কোন এক রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে মত্ত হয়ে উঠেছে।

রাজা জয়সিন্ধের বাগানবাড়ি।

বনহুর আর রহমান পাশাপাশি দু'টি বিছানায় শুয়ে আছে। বনহুর বারবার তাকাচ্ছে দেয়ালঘড়ির দিকে। রাত দ্বিপ্রহর।

রহমান জিজ্ঞাসা করল—সর্দার, আপনাকে আজ বেশ উত্তেজিত লাগছে— নতুন কোন সংবাদ আছে কি?

বনহুর শয্যায় উঠে বসল—আছে। দু'জন গুণ্ডা আমাদের হত্যা করতে আসছে।

সর্দার!

হ্যাঁ রহমান!

ঘাবড়াবার বান্দা রহমান নয়, তবে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তো।

বনহুর বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুতহস্তে নিজের বালিশগুলো বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রহমানকেও ইংগিতে সেই রকম কাজ করার জন্য আদেশ দিল।

এবার বনহুর তার নিজের শয্যার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। রহমানকে আদেশ দিল দরজার আড়ালে দাঁড়াতে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালা খুলে গেল।

রহমান আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

মুক্ত জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো যমদূতের মত দু'টি লোক। একজনের হাতে সুতীক্ষ্ণ ঝকঝকে ছোরা—অন্য জনের হাতে একটি তেলপাকা বাঁশের লাঠি।

রহমানের শরীর ফুলে উঠল রাগে কিন্তু সর্দারের বিনা আদেশে সে তো কিছুই করতে পারবে না। কাজেই নিশ্চুপ রইলো।

লোক দু'টির একজন গিয়ে দাঁড়াল রহমানের বিছানার পাশে। লোকটা হাতের লাঠি উঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নড়ে উঠলে বা জেগে গেলে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করবে।

দ্বিতীয় লোকটা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বাগিয়ে বনহুরের বিছানার দিকে এগিয়ে চলল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রহমান দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটা পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। তার চোখমুখে খুনের একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে।

এবার লোকটা একেবারে বনহুরের শয্যার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিই সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়া ভীষণভাবে বইতে শুরু করল। বাইরে গাছপালাগুলো যেন ভেঙ্গে মুচড়ে যাচ্ছে। পাশেই কোথাও বাজ পড়ল।

লোকটা মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাতের ছোরাখানা সজোরে বসিয়ে দিল বনহুরের শয্যায় শায়িত লম্বা বালিশে। পর মুহূর্তেই সে তার সঙ্গীকে নিয়ে দুর্যোগময় রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

বনহুর এবার তার শয্যার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো। রহমানও এসে দাঁড়াতোর অদূরে।

বনহুর হেসে উঠল----- হাঃ হাঃ হাঃ! ভীল সর্দার আজ নিহত হলো রহমান। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিজের শয্যার বালিশ থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

রহমান বলল— সর্দার, ইচ্ছা করলেই তো ওদের আমরা খতম করে দিতে পারতাম।

পারতাম, কিন্তু তা হবে না। আমি চাই আজ থেকে ভীল সর্দারের মৃত্যু হলো। এবার শোনো রহমান?

বলুন সর্দার....

তুমি এক্ষণি রাজপ্রাসাদে যাও, মহারাজার সংগে সাক্ষাৎ করে জানাও তোমার সংগী খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে খুন করেছে এ কথা তুমি জান না। এরপর তুমি তার কাছে বিদায় চেয়ে নেবে এবং যত শীঘ্র পার বজরায় ফিরে যাবে।

আর আপনি?

আমি রাজপ্রাসাদেই থাকব। যখন সময় পাব বা প্রয়োজন মনে করব, বজরায় গিয়ে তোমাদের সংগে সাক্ষাৎ করব। যাও, এই মুহূর্তে গিয়ে রাজপ্রাসাদে সংবাদ দাও তোমার সংগী খুন হয়েছে।

আচ্ছা সর্দার। কিন্তু.....

আর কিন্তু নয়।

আপনি....

আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

পরে জানতে পারবে।

❑

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি হলে কি হবে মঙ্গলসিন্ধের বাগানবাড়ির কক্ষে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে! কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বাগানবাড়ির অদূরে গাছপালা মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ল তবু বাঈজীর চরণের নূপুরধ্বনি থামল না।

মঙ্গলসিন্ধ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছিল, এমন সময় কঙ্করসিং এবং বিনয় সেন বৃষ্টিতে ভিজে হাজির হলো। মঙ্গলসিন্ধের দলে যোগ দিয়ে আসর সরগরম করে তুলল। মদ পান আর তালিতে মুখর হয়ে উঠল বাগানবাড়ির রঙমহল।

ওদিকে প্রকৃতি ভীষণভাবে তর্জন গর্জন শুরু করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল ভীল সর্দারের হত্যাকারী গুণ্ডা দু'জন।

মঙ্গলসিন্ধ ইংগিতে গুণ্ডাদ্বয়কে নিকটে আহ্বান জানাল। বলল— খবর কি?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল—সাবাড় করে দিয়েছি কুমার বাহাদুর!

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা কণ্ঠে বলল—একেবারে খতম?

হ্যাঁ!

কঙ্করসিং বলল—দু'জনকেই করেছ?

প্রথম গুণ্ডা–না, যাকে বলেছিলেন তাকেই হত্যা করেছি।

বিনয় সেন বলে উঠল—শুভ সংবাদ!

মঙ্গলসিন্ধ বলল—ভুল করোনি তো?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল—না হুজুর, ভুল করিনি। আমরা আগে সব জেনে নিয়েই কাজ করেছি।

বেশ করেছ। পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে মঙ্গলসিন্ধু গুণ্ডাদ্বয়ের হাতে গুঁজে দিল।

বিনয় সেনের মুখে ফুটে উঠল একটু বাঁকা হাসির রেখা!

বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিং আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠল। মঙ্গলসিন্ধ বলল—পথের কাঁটা দূর হলো!

কঙ্কর বলে উঠল—সাপ মেরে লেজ জিইয়ে রাখলে মঙ্গল, ওকেও খতম করা উচিত ছিল।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কি দরকার! আসল আপদ দূর হয়েছে, ওটাকে আর কেয়ার করি না।

আবার শুরু হলো বাঈজী নাচ।

মঙ্গলসিন্ধের আনন্দ আর ধরছে না। মদের পাত্র হাতে উঠিয়ে নিয়ে একের পর এক উজার করে চলল।

মঙ্গলসিন্ধের সংগে আনন্দে যোগ দিয়ে কঙ্করসিং মাথা দোলাচ্ছে আর করতালি দিচ্ছে।

বিনয় সেনও তাদের সংগে যোগ দিয়েছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে এখন। তবু আকাশে মেঘের ভীষণ ঘনঘটা রয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিন্তু বাজ পড়েছে না। গাছপালা দুলছে কিন্তু মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ছে না।

প্রকৃতি অনেকটা শান্ত আকার ধারণ করেছে।

এমন সময় দু'জন ভীমকায় লোক একটা যুবতীকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। যুবতীর হাত-পা-মুখ কাপড় দিয়ে মজবুত করে বাঁধা। এতটুকু নড়ার শক্তি নেই যুবতীর।

এলোমেলো চুল, ছিন্নভিন্ন বস্ত্রাঞ্চল। যুবতীটাকে মেঝেতে রেখে লোক দুটো সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের চোখেমুখে তখন মদের নেশা। মঙ্গলসিন্ধের ইংগিতে বাঈজীর নাচ বন্ধ হলো। বাঈজী একবার রাগতভাবে মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের মুখে তাকিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—এনেছ?

হ্যাঁ হুজুর এনেছি। বড় বদমাইস ছুকরি, আনতে বড় তকলিফ হয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ একটা উৎকট শব্দ করে উঠল। তারপর ইংগিত করল যুবতীর হাত-পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিতে।

কক্ষে অন্য যারা ছিল সবাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেনও উঠে দাঁড়াল, চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই মঙ্গলসিন্ধ বলল—আরে, তুমিও যে চললে, এসো এসো....

বিনয় সেন থমকে দাঁড়াল, একবার তাকিয়ে দেখল যুবতীটিকে। নীড়হারা কপোতীর মত থরথর করে কাঁপছে সে।

যুবতীর হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। যুবতী বন্ধনমুক্ত হতেই সোজা হয়ে বসলো। ভয়বিহবল দৃষ্টি মেলে তাকাল চারদিকে।

কঙ্কর সিং বলে উঠল—একেবারে খাসা মাল?

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে লালসা ঝরে পড়ছে। যে গুণ্ডাদ্বয় মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—কুমার বাহাদুর, এর চেয়ে শতগুণ সুন্দরী একটা মেয়ে আছে। কিন্তু.....

কিন্তু কি বলে ফেল বাবা? জড়িত কণ্ঠে বলল মঙ্গলসিন্ধ।

মেয়েটার মূল্য এগুলোর চেয়ে দশগুণ বেশি।

তাতে কি আসে যায়, হেমাঙ্গিনীকে বলো যত চায় তাই দেব, টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

আচ্ছা কুমার বাহাদুর।

বেশ, তাহলে যাও এবার তোমরা।

গুণ্ডা দু'জন বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেন হঠাৎ বলে উঠল—কুমার বাহাদুর, আমার শরীরটা ভাল বোধ করছি না, আজ বিদায় চাই।

মঙ্গলসিন্ধ টলতে টলতে এগুচ্ছিল যুবতীটার দিকে। বিনয় সেনের কথায় বলে ওঠে—এই খাসা মাল ছেড়ে চলে যাবে? আচ্ছা—যাও তবে।

কঙ্কর সিং তখন ঢেকুর তুলছিল হেউ হেউ করে, এবার বলল—যেতে দাও বন্ধু, সবাইকে চলে যেতে দাও....

বিনয় সেন বেরিয়ে গেল।

দুর্যোগের ঘনঘটা কিছুটা কমে এলেও এখনও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়ের বেগ কমে এলেও দমকা হাওয়া বইছে। বৃষ্টির জলে বাগানবাড়ির পথঘাট একাকার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলো বৃষ্টির জলে পড়ে ঝকমক করে উঠছে।

আলখেল্লা গায়ে গুণ্ডা দু'জন এগিয়ে চলছে।

হঠাৎ তাদের সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল বিনয় সেন।

চমকে উঠল গুণ্ডারা—দাঁড়িয়ে পড়তেই বিদ্যুতের আলোতে চিনতে পারল তারা বিনয় সেনকে। একজন বলে উঠল—আপনি!

বিনয় সেন একতোড়া নোট বের করে মেলে ধরলো তাদের সম্মুখে, তারপর বলল—আমাকে হেমাঙ্গিনীর নিকটে নিয়ে যেতে হবে। এই নাও তার জন্য প্রথম বখশিস।

প্রথম গুণ্ডা বলল—আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর, আমরা আপনাদের বান্দা থাকতে----যা বলবেন তাই করব। হাত বাড়িয়ে টাকার তোড়াটা নিল সে, তারপর বলল–ক'টা মেয়ে চান তাই এনে দিতে পারব।

বিনয় সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল—পারবে?

পারব।

বিনয় সেন লোক দু'টিকে সঙ্গে করে বাগানবাড়ির অদূরে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বিনয় সেন গুণ্ডা লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ আমি চাই নিজে গিয়ে যে মেয়েটাকে পছন্দ হয় তাকেই যত টাকা লাগে তাই দেব! আর তোমরাও মোটা বখশিস পাবে।

আচ্ছা হুজুর, তাই হবে। কিন্তু কথাটা আগে হেমাঙ্গিনী দেবীকে জানাতে হবে হুজুর, নইলে আমাদের জান থাকবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ হুজুর, মেয়েছেলে তো নয় সে, একেবারে মরদের বাবা!

সে আবার কি রকম?

হুজুর, হেমাঙ্গিনী দেবী মেয়েলোকের ব্যবসা করে কিনা, তাই তার ওখানে কোন অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া মানা আছে। তবে আপনার জন্য কোন চিন্তা নেই, আপনি তো আর পুলিশের লোক নন।

না না, আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমি সেখানে যাব এবং পছন্দমত মেয়ে বেছে নিয়ে নগদ টাকা গুণে দেব।

আচ্ছা হুজুর, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

টাকার তোড়াটা পকেটে রেখে চলে যাচ্ছিল গুণ্ডা দু'জন, বিনয় সেন পিছু ডাকে–এই শোন!

বলুন হুজর!

আমি যে তোমাদের দিয়ে অনেক নতুন মেয়ের সন্ধান নিচ্ছি একথা কুমার বাহাদুর যেন জানতে না পারে, বুঝেছ?

বুঝেছি হুজুর, বুঝেছি।

হ্যাঁ, আমার মনমত মেয়ে পেলে তোমাদের অনেক টাকা বখশিস দেব।

আচ্ছা হুজুর। কুর্ণিশ জানিয়ে পুনরায় তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল ওরা।

বিনয় সেনের চোখ দুটো হঠাৎ আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারটা মুঠোয় ধরলো সে।

বাগানবাড়ির বাঈজী কক্ষ থেকে তখন একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছিল।

বিনয় সেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলবার হাতে ছুটে চলল দ্রুতগতিতে। অন্ধকার রাতের আবরণে গা ঢাকা দিয়ে বিনয় সেন বাঈজী কক্ষের একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কক্ষে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সে আলোতে অর্ধমুক্ত জানালা পথে দেখল বিনয় সেন—সেই অসহায় যুবতীটাকে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত আক্রমণ করেছে মংগলসিন্ধ।

যুবতীর এলোমেলো চুল, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে, জামার হাতা ছিঁড়ে কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

মাতাল মংগলসিন্ধ জাপটে ধরেছে মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে সে—বাঁচাও বাঁচাও.....

কিন্তু এই বাগানবাড়ির পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বদ্ধকক্ষে কে তাকে বাঁচাতে আসবে!

সিংহের মুখে হরিণশিশুর মত ছটফট করছে মেয়েটা!

বিনয় সেন দাঁতে অধর দংশন করল, পরমুহূর্তেই তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

সংগে সংগে তীব্র আর্তনাদ করে যুবতীটাকে ছেড়ে দিল মংগলসিন্ধ, তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মংগলসিন্ধের আর্তনাদে পাশের কক্ষ থেকে শশব্যস্তে ছুটে এলো কঙ্করসিং। মেঝেতে বসে থাকা মংগলসিন্ধকে দেখতে পেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল তার দিকে, জড়িত কণ্ঠে বলল–কি হল বন্ধু? গুলির শব্দ আর তার সঙ্গে তোমার আর্তনাদ আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে বন্ধু। একি, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে! কঙ্কর সিং মঙ্গলসিন্ধের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

ওদিকে যুবতী ছাড়া পেয়ে মুক্ত দরজা দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল কিন্তু বাগানবাড়ির বাইরে বের হবার পূর্বে কয়েকজন পাহারাদার যুবতীটাকে ধরে ফেলল।

যুবতী আর্তকণ্ঠে বলল—ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। যুবতী পাহারাদারগণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

পাহারাদারগণ ইতোপূর্বে গুলির শব্দও শুনতে পেয়েছিল এবং পর পরই যুবতীটাকে পালাতে দেখে পাকড়াও করে ফেলেছিল।

যুবতী এবং পাহারাদারগণ যখন ধস্তাধস্তি করে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের মাঝখানে। প্রচণ্ড এক একটা ঘুষি লাগাতে শুরু করল ছায়ামূর্তি পাহারাদারগণের নাকে-মুখে পেটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাদারগণ যে-যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ছায়ামূর্তি শুধু দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

অদূরে দাঁড়িয়ে যুবতী হাঁপাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কে এই অজানা বন্ধু। কে এই মহান ব্যক্তি, এই মহাবিপদ মুহূর্তে বাঁচিয়ে নিল তাকে। ভয়ও হচ্ছে যুবতীর এমন শক্তিমান কে হতে পারে, অতগুলো পাহারাদারকে যে হটিয়ে দিতে পারল!

যুবতী ভাবছে কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বাগানবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো যুবতীর পাশে, বলল–শিগ্‌গির পালাতে হবে, নইলে আবার ওরা এসে যেতে পারে!

এতক্ষণে সাহস হলো যুবতীর, ছায়ামূর্তি ভূত-প্রেত বা ঐ ধরনের কিছু নয়—সে মানুষ। তাছাড়া ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর যুবতীর মনে আশ্বস্তি এনে দিল। বলল যুবতী–আপনি কে? আমাকে এই বিপদের সময় বাঁচিয়ে নিলেন?

ছায়ামূর্তি ব্যস্তকণ্ঠে বলল—বলব পরে, এখন চল পালাতে হবে এখান থেকে।

যুবতী বলল–চলুন, কোথায় যাব...

ছায়ামূর্তি যুবতীর হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল বাগানবাড়ির পেছন দিকে। ছুটতে ছুটতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছে যুবতী। একটার পর একটা বিপদ চলছে, তদুপরি গোটা দিন খাওয়া হয়নি। বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যুবতী।

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে ধরে ধরে নিয়ে চলল যুবতীকে।

ততক্ষণে বাগানবাড়ির মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে। আলো জ্বেলে উঠছে একটার পর একটা।

ছায়ামূর্তির মুখের দিকে তাকাল যুবতী—বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল—আপনি!

ছায়ামূর্তি মুখের আবরণ ইতোমধ্যে খুলে ফেলেছিল, বলল–হাঁ, আমাকেই তুমি কিছু পূর্বে কুমার বাহাদুরের বাগানবাড়ির কক্ষে দেখেছিলে, আমার নাম বিনয় সেন!

আপনি ওদের লোক হয়ে....

যাক এখানে বেশি দেরী করা উচিত হবে না, শিগগির বাগানবাড়ির দেয়াল টপকে ওপারে পৌছতে হবে।

যুবতী হতাশ কণ্ঠে বলল—তাহলে উপায়? আমি তো অত উঁচুতে উঠতে পারব না।

আমি তোমাকে সাহায্য করব—এসো—বিনয় সেন হাঁটু গেড়ে বসল–আমার কাঁধে পা রেখে দেয়ালের উপর উঠে পড়।

যুবতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, একটা ভদ্রলোকের কাঁধে পা রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বিনয় সেন ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠল—ভাববার সময় নেই বোন, তুমি শিগগির আমার কাঁধে পা রেখে প্রাচীরের উঠে বস।

অজানা-অচেনা একটা যুবকের মুখে মধুর এ বোন সম্বোধন যুবতীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করল। অন্ধকারেও যুবতী ভাল করে তাকাল্ বিনয় সেনের দিকে, তারপর তার কথামত কাজ করল সে।

❑

বাগানবাড়ির বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যুবতী। বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করল—কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?

যুবতী ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বলল—জানি না।

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা গলায় বলল—সেকি, কোথায় যাবে জান না?

না। এদেশে আপনজন আমার কেউ নেই। ওরা আমাকে কান্দাই শহর থেকে ধরে এনেছে। কান্দাইয়ের পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে আমি---.

বিনয় সেন অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে তুমি!

হ্যাঁ। আমাকে ওরা চুরি করে এনেছে।

আচ্ছা চল আমার সঙ্গে, চিন্তিত হবার কিছু নেই।

আপনি কুমার বাহাদুরের লোক, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনি যদি বিপদে পড়েন?

সেজন্য তোমার ভাববার কিছুই নেই সুফিয়া, এস আমার সংগে।

বিনয় সেন আর সুফিয়া হেঁটে এগিয়ে চলল।

রাত ভোর হবার পূর্বেই তাদেরকে শহরের বাইরে পৌঁছতে হবে।

ওদিকে বিনয় সেনের সংগে সুফিয়া যখন পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে, তখন রাজপ্রাসাদের বাইরে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। ভীল সর্দারেরবেশে

রহমান হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে–খুন----খুন------আমার বন্ধু খুন হয়েছে!

পাহারাদারগণ রহমানকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রাত ভোর হতে দাও, রাজাকে বলে একটা ব্যবস্থা কর।

অগত্য ভীল সর্দারবেশী রহমান সিংহদ্বারের পাশে বসে রইল।

ভোর হল।

রাজা জয়সিন্ধ রাজদরবারে এসে বসলেন।

প্রথমেই দরবারকক্ষে হাজির হলো ভীল সর্দারবেশী রহমান— মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে, আমার বন্ধু খুন হয়েছে আপনার বাগানবাড়িতে। আমরা ঘুমিয়েছিলাম, সেই সময় কে বা কারা তাকে খুন করে পালিয়েছে!

মহারাজ জয়সিন্ধের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করলেন মহারাজ–আমার অতিথি খুন! এত সাহস কার যে আমাকে এমন একটা অভিসম্পাতের মুখে ফেলল। মহারাজ জয়সিন্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি অতিথিদের সম্মান বুঝতেন, সকলের আগে অতিথি সেবাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম।

মহারাজা জয়সিন্ধকে অত্যন্ত উত্তেজিত হতে দেখে ভীল সর্দারবেশী রহমান বলে উঠল—মহারাজ, যা হবার হয়েছে। যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না। কাজেই আমি আমার বন্ধুর লাশসহ বিদায় চাই।

মহারাজ জয়সিন্ধ কি আর করবেন— মনের ব্যথা মনে চেপে ভীল-সর্দারকে বিদায় দিলেন।

ভীল সর্দার বিদায় গ্রহণ করতেই একজন রাজকর্মচারী রাজ দরবারে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

মহারাজার মন তখন বিমর্ষ, ভীল সর্দার বিদায় জানিয়ে বিষণ্ন মনে তার কথা ভাবছেন, রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞেসা করলেন–কি খবর মোহন্ত?

মোহন্ত বলে উঠলেন মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে; রাজকুমার আহত হয়েছেন!

মহারাজ জয়সিন্ধ অবাক কণ্ঠে বলেন–রাজকুমার আহত হয়েছে।

হ্যাঁ মহারাজ!

জয়সিন্ধ এবার আপন মনেই বলে উঠলেন—ভীল সর্দার নিহত রাজকুমার আহত?—এসব কি শুনছি মোহন্ত?

তাই তো দেখছি মহারাজ।

কুমার এখন কোথায়?

তিনি এখন রাজঅন্তঃপুরে।

কি করে সে আহত হল?

মহারাজ, তিনি শিকারে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছেন।

কালই তাকে সন্ধ্যায় আমি দেখেছি, রাতে সে কোথায় শিকারে গিয়েছিল?

মোহন্ত বোবা বনে গেল। তাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই সে বলেছে। হঠাৎ কোন বুদ্ধি তার মাথায় আসছিল না, মহারাজ জয়সিন্ধ ধমক দিলেন–চুপ করে আছ কেন, বল রাতে সে কোথায় গিয়েছিল?

মোহন্ত আমতা আমতা করে জবাব দিল বোধ হয় বাগানবাড়িতে!

হ্যাঁ এবার আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার বুঝতে পেরেছি আমার অতিথি ভীল সর্দারকে বাগানবাড়িতে কে হত্যা করেছে!

না না মহারাজ, কুমার বাহাদুর তাকে হত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেনি।

তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, যাও—রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যাও। পরক্ষণেই সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন রাজা জয়সিন্ধ—সেনাপতি, এই মুহূর্তে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করুন।

সেনাপতি উঠে বিনীত কণ্ঠে বলেন—মহারাজ, না জেনে কুমার বাহাদুরকে এভাবে

যা বললাম আদেশ পালন করুন। বিচারকালে সব চিন্তা করব।

সেনাপতি রাজাদেশ পালন করার জন্য রাজদরবার ত্যাগ করেন।

কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিকসহ কুমার মঙ্গলসিন্ধের কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনাপতি এবং অসুস্থ কুমারকে শয্যায় শায়িত দেখে বিনীত কণ্ঠে বললেন—কুমার বাহাদুর আপনি বন্দী!

মঙ্গলসিন্ধ পায়ের ব্যথায় কাতর ছিল, সেনাপতিকে সশস্ত্র সৈনিক সহ তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই অনুমানে বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তারা এ কক্ষে প্রবেশ করেছে। সেনাপতির কণ্ঠে আর বন্দী হবার সংবাদ জানতে পেয়ে বিস্ময়ভরা গলায় বলল—আমি বন্দী।

হ্যাঁ কুমার বাহাদুর।

কেন আমি বন্দী জানতে পারি?

রাজার আদেশেই আমি আপনাকে বন্দী করতে এসেছি।

আমার অপরাধ?

অপরাধ বাগানবাড়িতে ভীল সর্দার নিহত।

ভীল সর্দারের খুনের সঙ্গে আমি জড়িত এ কথা কে বলল তাকে?

শুধু জড়িতই নন আপনিই তাকে হত্যা করেছেন বলে মহারাজ সন্দেহ করছেন।

বুঝেছি!

আপনাকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ হয়েছে। সেনাপতির ইংগিতে সৈনিকগণ রাজকুমারের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিল।

যদিও রাজকুমারের হাতে হাতকড়া পরাতে সেনাপতির মনে ব্যথা জাগছিল তবু বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হল।

মঙ্গলসিন্ধ বন্দী হয়ে আহত সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। অজ্ঞাত গুলিটাই তার সবকিছু মাটি করে দিয়েছে।

সেনাপতি মঙ্গলসিন্ধকে রাজ কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

❑

সুন্দর বজরায় সুসজ্জিত একটা কক্ষে সুফিয়া বসেছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে বিনয় সেন, সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল শোন, এখানেই আমি থাকি, তুমিও এখানেই থাকবে।

কিন্তু....

কিন্তু কি বোন?

আমার বাবা-মার কাছে কোনদিন আর ফিরে যেতে পারব না?

কেন পারবে না, তুমি নিশ্চিত থাক আমি তোমাকে কান্দাইয়ে পৌঁছে দেব বোন।

বিনয় সেনের মধুর কণ্ঠস্বরে সুফিয়ার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ যেন মানুষ নয়—দেবতা!

সুফিয়া বলে—আপনাকে আমি ভাই বলে ডাকব।

বেশ, ডেক!

বসুন ভাইজান আপনি আমার পাশে, সত্যি আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাব....

বিনয় সেন সুফিয়ার পাশে বসে পড়ল—থাক, বোন হয়ে বড় ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না।

সুফিয়া আনমনে কিছুক্ষণ বজরার মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় সেন বলল—কি ভাবছ সুফিয়া?

ভাবছি অসৎসঙ্গে বাস করেও কি করে আপনি এত মহৎপ্রাণ হতে পেরেছেন!

তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি বলেই যে আমি মহৎপ্রাণ বা উদার ব্যক্তি, এ কথা ভাবা ভুল সুফিয়া। আমি অসৎসঙ্গে বাস করে অসৎব্যক্তিই বনে গেছি, কিন্তু....

না না, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। একটা নারীকে একা অসহায় অবস্থায় পেয়েও যে ব্যক্তি তাকে বোনের সম্মান দিতে পারে সে যে কতবড় উন্নত প্রাণ তা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

সুফিয়া, তোমার চিন্তাধারা চিরদিন যেন অক্ষয় থাকে। আচ্ছা সুফিয়া, একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করব, ঠিক জবাব দেবে?

একটা কেন, হাজার কথা জিজ্ঞাসা করুন ভাইজান, আমি তার জবাব দেব।

আচ্ছা, তোমাকে যারা চুরি করে এনেছিল তারা কে বা কারা এ সম্বন্ধে কিছু আমাকে জানাতে পার?

হাঁ পারি। আমিও সেই কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। শুনুন ভাইজান, একদিন আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ফিরে আসছিলাম-পথের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করে, গাড়ির ড্রাইভারকে আহত করে আমাকে নিয়ে পালায়। তারা আমার হাত-পা মুখ এমনভাবে বেঁধে ফেলেছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা করেও নিজকে ওদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নেয়া হল—তারপর আর কিছু স্মরণ নেই আমার! আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল তখন নিজেকে একটা নৌকার মধ্যে দেখলাম। আমার হাত পা মজবুত করে বাঁধা রয়েছে। চোখ মেলতেই দেখলাম কয়েকজন ভীষণ চেহারার লোক নৌকার মুখে বসে আছে, লোকগুলো আমাকে দেখে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। মি পাশ ফিরলাম, সংগে সংগে বিস্ময়ে হতবাক হলাম-আমার পাশেই আরও কয়েকজন মেয়েকে আমারই মত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে দেখলাম।

বিনয় সেন তন্ময় হয়ে সুফিয়ার কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল।

সুফিয়া তখনও বলে চলেছে—তারপর আমাদের নৌকা একদিন এই শহরে পৌছল। ইতোমধ্যে সবগুলো মেয়েরই জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সবাই মাথা কুটে কাঁদাকাঁটি করতে লাগল কিন্তু পাষাণহৃদয় লোকগুলোর প্রাণে এতটুকু মায়া হল না। ঘাটে নৌকা পৌছানোর পর রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়িতে করে একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও আমাদের হাতগুলো বাঁধা ছিল, পায়ে কোন বাঁধন ছিল না।

বিনয় সেন অস্ফুট কণ্ঠে বলল—তারপর?

তারপর আমাদের সবাইকে সেই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। রাতের অন্ধকার হলেও আমরা বুঝতে পারলাম শহরের বাইরে কোন পুরোন বাড়ি সেটা।

এখন দেখলে চিনতে পারবে সে বাড়িটা? প্রশ্ন করল বিনয় সেন।

সুফিয়া বলল–না ভাইজান, চিনতে পারব না। কারণ যে অবস্থায় আমি সেই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম তা ছিল অতি মর্মান্তিক অবস্থা, আমরা সহজে বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলাম না, তাই আমাদের কঠিনভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল।

তারপর?

তারপর কি বলব ভাইজান; আমাদের কয়েকজনকে যখন অন্দর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল তখন আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিন্তু যেখানে আমাদের হাজির করা হল সে এক ভয়ংকর স্থান। কথাটা বলে হাঁপাতে লাগল সুফিয়া। একটু থেমে পুনরায় বলতে শুরু করল–দেখলাম আমাদের সামনে একটা বিরাটদেহ নারীমূর্তি, যেন রাক্ষসী—চোখ দুটো তার আগুনের ভাটা। অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারপর একগাদা নোট গুণে দিল যারা আমাদের সকলকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের একজন সর্দার গোছের লোকের হাতে। লোকগুলো টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার রাক্ষসী নারীমূর্তি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তার একজন অনুচরকে ইংগিত করল। অদূরে একটা অদ্ভুত বেঁটে মোটা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে নাকি সুরে বলল–চল তোমরা!

কি করব আর আমরা, ঐ বেঁটে লোকটাকে অনুসরণ করলাম। এত সহজে আমরা সেখান থেকে যেতাম না! কিন্তু নারীমূর্তির যে রূপ তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য পা বাড়ালাম।

বেঁটে লোকটার সঙ্গে এবার যে কক্ষে প্রবেশ করলাম সে অতি মর্মান্তিক স্থান। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমাদেরই মত আরও অনেক মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন। চোখ অশ্রু ছলছল, বুঝতে পারলাম ওদেরকেও আমাদের মতই ধরে আনা হয়েছে।

এবার থামল সুফিয়া, কি যেন ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বলল—আর কি বলব ভাইজান, এরপর রোজ রাতে লোক আসে আর বেছে বেছে যে মেয়েকে পছন্দ করে তাকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, ঠিক ছাগল–ভেড়ার মত। আমাকে একদিন....

বিনয় সেন বলে উঠল—থাক, সব বুঝতে পেয়েছি। দাঁতে দাঁত পিষল বিনয় সেন, দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হল; চোখ জ্বলে উঠল ধক্ ধক্ করে।

সুফিয়া অবাক হয়ে তাকাল তার মুখের দিকে, এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়; নিজের ভাইয়ের পাশে যেন সে বসে রয়েছে।

বিনয় সেন সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল—সুফিয়া, আমি শপথ করছি, যতদিন আমার বোনদের উদ্ধার করতে না পারব ততদিন আমি নিশ্চিত নই।

আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে উঠল সুফিয়া—ভাইজান।

বিনয় সেন সস্নেহে সুফিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

❑

দস্যু বনহুরের বজরা।

বজরার একটি কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। ললাটে তার গভীর চিন্তারেখা, ভ্রূকুটি কুঞ্চিত করে কিছু ভাবছিল সে। কক্ষে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

এবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল বনহুর, দু'ঠোটের ফাঁকে একটা সিগারেট চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল, তারপর পায়চারী শুরু করল বজরার মেঝেতে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলল বনহুর— সিগারেটের ধোঁয়ার বজরার ক্যাবিন ধূমায়িত হয়ে উঠল।

এমন সময় নদীতীরে অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। বনহুর, হাতের সিগারেটটা বজরার মেঝেতে নিক্ষেপ করে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে ফেলল, তারপর জানালা দিয়ে তাকাল নদীতীরে।

সেই মুহূর্তে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্নিশ জানিয়ে বলল—সর্দার, তাজ এসে গেছে।

চল।

বনহুর আর রহমান বজরা থেকে নেমে নদীতীরে এসে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। বনহুর তাজের পিঠে বসল, রহমানও তার অশ্বে উঠে বসল, ছুটতে শুরু করল অশ্ব দু'টি।

বালুকাময় নদীতীর বেয়ে বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

বনহুরের দেহে স্বাভাবিক নাগরিক ড্রেস।

রহমানের শরীরেও তাই। কাল অশ্বপৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত যুবকদ্বয় নগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঝিন্দ শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা হোটেল। নাম তার 'জানবাগ'। হোটেলটি দিনের বেলায় জাঁকাল না হলেও রাতের বেলা একেবারে গুলজার হয়ে ওঠে। দিনের বেলা জানবাগে কেমন ঝিমান ঝিমান ভাব থাকে। আর রাতের বেলা তার উল্‌টো।

গাড়িতে গাড়িতে ভরে ওঠে জানবাগের সম্মুখভাগ। কত রকমের গাড়ি— নতুন পুরোন ছোঁট-বড় হরেক রকমের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের এবং দেশ-বিদেশের বহু রকমের লোকের হয় আমদানি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা এদিকে খুব কমই আসে। তবু একেবারে যে আসে না তা নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় অতি ভদ্রসন্তানও জানবাগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

গভীর রাত।

জানবাগ হোটেল এখনও নিশ্চুপ হয়ে পড়েনি। আলোয় আলোময় গোটা হোটেল। হোটেলে ভেতর থেকে তখনও হাসি-গান আর বোতলের টুনটান শব্দ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে ভেসে আসছে জড়িত কণ্ঠস্বর।

জানবাগের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন অশ্বারোহী।

দস্যু বনহুর আর রহমান। অশ্ব থেকে নেমে সোজা তারা হোটেল জানবাগে প্রবেশ করল।

হোটেলে একপাশে তখন তাস পেটাপেটি চলছে, জুয়া খেলছে লোকগুলো। দুটো যুবতী এত রাতেও জুয়াড়ীদের মনে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। যুবতীদ্বয় সিগারেট থেকে রাশিকৃত ধূম্রনির্গত করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল জুয়াড়ীদের মুখে।

হোটেলের ম্যানেজার একটা চেয়ারে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। দু' একটা ভদ্রসন্তান এখনও দু'একটা টেবিলে আঁকড়ে বসে আছে। সামনে বিলেতী মদের খালি বোতল আর গ্লাস। হয়তো নেশার মাত্রা বেশি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে রয়েছে। কেউ কেউ জড়িত কণ্ঠে গান ধরেছে।

অপরিচিত যুবকদ্বয়কে হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে একটা বয় ম্যানেজারকে বলল—স্যার, নতুন লোক এসেছে।

ম্যানেজার চোখ মেলে তাকিয়ে হাই তুলল, আরপর আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল—কি চাই?

বনহুর বলল—আমরা বিদেশী, এই হোটেলে কয়েক দিন থাকতে চাই।

বেশ থাকবেন। তারপর বয়কে লক্ষ্য করে বলল ম্যানেজার—এঁদের ক্যাবিনে নিয়ে যাও।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল—আমাদের সংগে দুটো অশ্ব আছে।

ওঃ আচ্ছা, তাদের জন্য আমি আমাদের ঘোড়াশালে জায়গা করে দেব।

বনহুর আর রহমান বয়ের সংগে তাদের নির্দিষ্ট ক্যাবিনে চলে গেল।

বনহুর ও রহমান চলে যেতেই ম্যানেজার এগিয়ে গেল। যে দলটা গোল টেবিলের পাশে বসে তাস খেলছিল, ফিস ফিস করে তাদেরকে কিছু বলল।

সংগে সংগে দু'জন উঠে দাঁড়াল, যে কক্ষে বনহুর আর রহমান বিশ্রামের আয়োজন করছিল সেই কক্ষে প্রবেশ করে বলল— চর্লিয়ে সাব থোরা খেলোগে?

বনহুর তাকাল লোক দু'টির দিকে, তারপর বলল—বহুৎ আচ্ছা, তুম যাও মায় আতা হুঁ।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল।

রহমান বলল—সর্দার, ওদের হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

হেসে বলল বনহুর–আমাদের হাবভাবই বা এত সুবিধের কোথায়! চল দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

সর্দার, যে লোক দুটি এখন এসেছিল ওদের একজনকে আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হল।

বনহুর বলল—হাঁ, তাকে কান্দাই শহরে দেখেছ, নাথুরামের ওখানে।

হ্যাঁ সর্দার, এবার মনে পড়েছে, নাথুরামের সহকারী–গোবিন্দনাথ ওর নাম না?

ঠিক চিনতে পেরেছ রহমান। শোন, এই যে দেশব্যাপী নারীহরণ শিশুহরণ চলছে, এ সবের দলপতি ছিল নাথুরাম। নাথুরামের মৃত্যুর পর কান্দাই এবং বিভিন্ন দেশ থেকে নারীহরণ এবং শিশুহরণের হিড়িক কমে যায়নি, নাথুরামের অভাবে তার সহকারী গোবিন্দনাথ এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের কথায় রহমান বিস্ময়ভরা গলায় বলল—সর্দার, এত খোঁজ আপনি পেলেন কোথায়?

রহমান, অচিরেই আমি আরও এমন খবর তোমাকে দেব, যা শুনে এবং দেখে তুমি শুধু বিস্মিত হবে না, স্তব্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা চল, ওরা হয়তো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

বনহুর আগে আগে চলল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই তাকে আসন করে দিল একটা লোক। বনহুর বসে পড়ল।

রহমান দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

খেলা শুরু হল।

যে দু'টি যুবতী এতক্ষণ অন্যান্য পুরুষকে খেলায় উৎসাহ দিচ্ছিল। তারা এবার সরে এসে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হায় দাঁড়াল।

বনহুর চেয়ারসমেত আরেকটু সরে বসল।

যুবতী পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, এবার বনহুরের চেয়ারের হাতলে এসে বসলো যুবতী।

বনহুর তখন খেলায় মেতে উঠল।

অল্পক্ষণেই চূড়ান্তভাবে জিতে গেল বনহুর। অবশ্য এর পেছেনে ছিল যুবতীদের অদৃশ্য ইংগিত। যদিও যুবতীদ্বয় তাদের দলকে জয়লাভ করার জন্য নিযুক্ত ছিল, কিন্তু আজ যেন তাদের কি হয়ে গেল, বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার সর্বনাশ করতে মন তাদের চাইল না।

বনহুর জিতে যেতেই খেলোয়াড়গণের মধ্য থেকে একজন নেতা ধরনের লোক যুবতীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল—এবার তোমরা যাও।

যুবতীদ্বয় তাদের কথার চাকর, বিনা অনুমতিতে ওখানে থাকতে পারে না, চলে যাবার সময় ওদের প্রথম মেয়েটা বলল—একটা নাচ দেখাব!

রাজী হয়ে গেল লোকটা, অনেকক্ষণ নীরস খেলার মাধ্যমে হাঁপিয়ে উঠছিল ওরা, বলল-আচ্ছা, নাচ দেখাও একটা।

যুবতী সঙ্গে সঙ্গে নাচতে আর গাইতে শুরু করলো।

যুবতী সুন্দরী বটে, নাচটাও তার সুন্দর।

বনহুরকে লোকগুলো পুনরায় খেলার জন্য বললো।

যুবতীটি তখন নাচতে নাচতে গান গইছে। অপূর্ব সুন্দর গানের সুর। মুগ্ধ হল বনহুর, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওদিকে লোকগুলো খেলার জন্য বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করছে।

যুবতী নাচের মধ্যে ইংগিতে তাকে পুনরায় খেলার জন্য নিষেধ করতে লাগল।

চতুর লোকগুলো যুবতীর ইংগিতভরা নাচ বুঝতে পারল, ধমক দিয়ে নাচ থামিয়ে দিয়ে বলল—যাও।

যুবতীদ্বয় চলে গেল।

বনহুরও উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে টাকাগুলো তুলে পকেটে রাখলো।

অন্যান্য খেলোয়াড় তাকাল তাদের দলপতির মুখের দিকে। হুকুম পেলেই আক্রমণ করবে। কিন্তু দলপতি কি যেন ভেবে তখন নিশ্চুপ থাকার জন্য ইংগিত করল।

বনহুর টাকাগুলো পকেটে রেখে চলে গেল নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায়। রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোর হয়ে গেল।

সেদিনের মত কোন ঘটনাই ঘটল না হোটেলে।

বনহুর আর রহমান আজ বের হল না শহরে।

বেলা দ্বিপ্রহরের নির্জন ক্যাবিনে বনহুর শুয়ে শুয়ে কিছু ভাবছে। রহমান বাইরে গেছে কোন কারণে।

এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করল।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে কিছুটা অবাক হল, কিন্তু মনোভাব গোপন করে বলল—এস।

যুবতী চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—আপনারা ভদ্রলোক—এ হোটেলে থাকবেন না, এখানে সব সময় বিপদ ঘটতে পারে। আজই চলে যান, দোহাই আপনাদের চলে যান!

হেসে বলল বনহুর—কেন এত ভয় পাচ্ছ! এ হোটেলে এত ভয়ই বা কিসের!

যুবতী এবার বসে পড়ল, বনহুরের বিছানায়, অতি ঘনি/স হয়ে বসল, তারপর বলল আপনাকে ওরা ভাল নজরে দেখছে না। হোটেলের ম্যানেজার আপনার পেছনে ওদের লেলিয়ে দিয়েছে, ওরা আজ রাতে আপনাকে.....

যুবতীর কথা শেষ হল না, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উবু হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ধরে ফেলল যুবতীটাকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তার বুকের বাম পাশটা। একটা পিস্তলের গুলি চলে গেছে যুবতীর বক্ষ ভেদ করে।

যুবতী বনহুরের মুখের দিকে তাকাল, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, অতি কষ্টে একটা কথা সে উচ্চারণ করল—আজ রাতে---আপনাকে ওরা --খু----আর বলতে পারল না যুবতী, ঢলে পড়ল বনহুরের হাতের ওপর।

বনহুরের দস্যু প্রাণও ব্যথায় গুমরে কেঁদে উঠল। তারই মঙ্গলের জন্য একটা নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে গেল।

বনহুর এবার কালবিলম্ব না করে কম্বলটা দিয়ে যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে ঢেকে রেখে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান!

রহমানকে দেখে বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে এবং মেঝেতে কম্বল ঢাকা কিছু দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল, চাপাকণ্ঠে বলল—সর্দার, এর নিচে কি?

বনহুর বলল—কালকের সেই যুবতীর মৃতদেহ।

সর্দার! চমকে উঠল রহমান।

বনহুর তখনও নিশ্চুপ, ব্যথায় মনটা তার টনটন করছিল, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না।

রহমান বলল—সর্দার, কে ওকে হত্যা করল?

জানি না।

সে কি সর্দার!

হ্যাঁ রহমান, বেচারী আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল—আজ রাতে আমি খুন হবো-----

সর্দার!

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে হোটেলের ম্যানেজার।

বনহুর তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাইরে, ম্যানেজার কিছু বুঝতে পারেনি। তখনকার মত বনহুর নিশ্চিত হল, জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ আমার ক্যাবিনে, কি খবর ম্যানেজার সাহেব?

ম্যানেজার একটু আশ্চর্য কণ্ঠে বলল—এদিকে একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল, তাই এলাম খবর নিতে।

বনহুর চট করে বলল—না কিছু না! আমার সঙ্গীটার পায়ে চোট পেয়ে কিছুটা কেটে গেছে তাই।

ওঃ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেল ম্যানেজার।

ফিরে এল বনহুর, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল—শিগগির এই লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে।

রহমান বলল–কিন্তু কি করে তা সম্ভব সর্দার। হঠাৎ কেউ যদি আবার এসে যায়!

তার পূর্বেই কাজ শেষ করতে হবে।

কিন্তু এখানে থাকাটা কি এখন ভাল হবে সর্দার?

পরে চিন্তা করা যাবে। এস কাজ করা যাক!

বনহুর আর রহমান যুবতীর লাশটা মজবুত করে কম্বলে জড়িয়ে বাথরুমে নিয়ে রাখল। তারপর পানি দিয়ে ক্যাবিনের মেঝেটা ধুয়ে ফেলল পরিষ্কার করে।

গোটা দিনটা কেটে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঝিন্দ শহরের বুকে জ্বলে উঠল অসংখ্য আলোর মেলা। একের পর এক গাড়ি এসে থামতে লাগল জানবাগ হোটেলের সামনে। নানারকমের গাড়ি আর বিচিত্র রকমের মানুষে ভরে উঠল হোটেল জানবাগ।

বনহুরকে রহমান বলল—সর্দার, আজ রাতে এ হোটেল ত্যাগ করতে হবে।

বনহুর বলল—যত সহজ মনে করছ রহমান, তত সহজে এখান থেকে বিদায় নেয়া সম্ভব হবে না।

তাহলে উপায়!

উপায় একটা করতে হবে।

এ খুনের কথা যদি কেউ জেনে ফেলে!

রহমান, তুমি মনে কর এ হত্যার ব্যাপারে হোটেলের কেউ জানে না!

না জানলে খুন হবে কেন, নিশ্চয়ই জানে। তবে এখনও ওরা এ খুন সম্বন্ধে এমন নিশ্চুপ রয়েছে কেন, বুঝতে পারছি না সর্দার।

যুবতীর হত্যারহস্য প্রকাশ পেলে পুলিশের আমদানি হবে এটা এরা চায় না। তা ছাড়া নিজেরাই যখন ওকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছে তখন ওদের মাথাব্যাথার কিছু নেই।

তখন ম্যানেজার এসেছিল, সেও তো কিছু বলল না সর্দার।

সব জেনেই না জানার ভান করল। তুমি কি মনে কর ম্যানেজার যুবতীর হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ঐ রকমই তো মনে হল!

ওটা নিছক অভিনয়। চল, দেখা যাক কি হয়!

বনহুর আর রহমান হোটেল কক্ষে প্রবেশ করতেই নজর পড়ল অদূরে উপবিষ্টা পূর্বদিনের সেই যুবতী দু'জনের আরেকজন। চেহারা কেমন যেন বিমর্ষ মলিন, চোখমুখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত ভাব। সকলের অজ্ঞাতে যুবতী বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর একবারমাত্র তাকিয়ে যুবতীর দিকে পেছন ফিরে একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে বসল। তাকে বাঁচাতে চেয়ে নিরপরাধ একটা জীবন বিনষ্ট হয়েছে। আর নয়, ঐ যথেষ্ট। যুবতী যেটুকু বলে গেছে তাই আত্মরক্ষায় তাকে সতর্ক রাখবে।

বনহুর আসন গ্রহণ করতেই রহমান বনহুরের পেছনে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। এদিকে মুখ করে বসলে সর্দারের দৃষ্টির আড়ালে যা ঘটে বা হয় সেটা দেখতে পাবে সে! সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে লক্ষ্য রাখল সে।

হোটেল কক্ষ নানা ধরনের মানুষে ভরে উঠল।

নারীপুরুষ সবাই এসেছে।

হঠাৎ চমকে উঠল বনহুর, হোটেলকক্ষে প্রবেশ করল একটি বিশাল বপুধারিণী নারীমূর্তি। তেলের পিঁপে বললে ভুল হবে না।

রহমান মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসল, সর্দারের দিকে তাকিয়ে দেখল–কিন্তু একি, সর্দারের চোখে একটা তীব্র চাহনি, রহমানও এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল মহিলাটিকে।

অন্যান্য মহিলার মতই তার হাতে একটি ব্যাগ। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, একটা মস্তবড় চামড়ার ব্যাগ।

মহিলাটি হোটেলকক্ষে প্রবেশ করতেই হোটেলের কর্মচারিগণ শশব্যস্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। ম্যানেজার সোজা গিয়ে মহিলাটির হাত চুম্বন করল।

মহিলা এসবে খুশি হল না তেমন। একবার হোটেলকক্ষের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভেতরের কক্ষে অদৃশ্য হল।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মদের দোকানটার পাশে, বলল—ম্যাচটা দাও তো?

মদের বোতল নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল দোকানী, তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে ম্যাচটা বের করে বাড়িয়ে ধরল বনহুরের দিকে।

বনহুর ম্যাচটা হাতে নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর বাঁকা চোখে মদের দোকানীর দিকে তাকিয়ে বলল—যে সম্রাজ্ঞী এলেন উনি কে?

দোকানী চাপা গলায় বলল—এই হোটেলের মালিক।

হোটেলের উপযুক্ত মালিকই বটে! বনহুর কথাটা বলে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

ততক্ষণে পূর্ব দিনের সেই বিমর্ষমনা যুবতী নাচতে শুরু করেছে।

এদিকে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে, হোটেলের প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে মত্ত, ঠিক তখন সকলের অজ্ঞাতে বনহুর উঠে দাড়াল, দ্রুত এগিয়ে চলল সে কক্ষের দিকে, যে কক্ষে একটু পূর্বে ভীমকায় মহিলাটি প্রবেশ করেছে।

বনহুর সেই কক্ষের পাশের কক্ষে প্রবেশ করতেই তার কানে ভেসে এলো হাঁড়ির মত যেন কোন মহিলার কণ্ঠস্বর।

দেয়ালে কান লাগিয়ে দাঁড়াল বনহুর।

পাশের ঘর থেকে শোনা গেল হেঁড়ে গলায় মহিলার সুমিষ্ট ভাষণ—কুমার বাহাদুর জখম হয়েছে, কবে সারবে না সারবে তার জন্য আমি গ্রাহক ভাগিয়ে দেব? এমন মেয়েই নয় হেমাঙ্গিনী।

পরক্ষণেই নরম পুরুষকণ্ঠ—দেখুন হেমাঙ্গিনী দিদি এই সামান্য ক'টা দিন সবুর করুন, কুমার বাহাদুর অনেক করে বলে দিয়েছেন....

রেখে দাও তোমার কুমার বাহাদুর, বেটা পুরুষ নয়—পুরুষের বাচ্চাও নয়। সামান্য পায়ের হাড়ে গুলি লেগেছে তাই মরণ শয্যা নিয়েছে। অমন দশটা গুলি আমার চামড়া কাটতে পারবে না।

দেখুন রাজার ছেলে, তাছাড়া তাদেরই রাজ্যে যখন আমরা বাস করি.....

বাস করি বলেই কি তারা আমাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে নাচাবে, সে বান্দা হেমাঙ্গিনী নয়, মনে রেখ কেশব চাঁদ।

বনহুর বুঝতে পারল, এ হোটেলের ম্যানেজারের নাম কেশব চাঁদ।

ওদিকে রহমান পেছন ফিরে হতবাক, এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও সর্দার ভেগেছেন। গেলেন কোথায়, রহমান চারদিকে দেখতে লাগল!

এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই কখন যে আবার বনহুর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসে নাচ দেখছে লক্ষ্যই করেনি রহমান। এবার অবাক হল, অস্ফুট কণ্ঠে বলল—সর্দার, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

একটা নতুন কিছু আবিষ্কারে! চুপ, নাচ দেখ।

বনহুর এবার উঠে গিয়ে জুয়ার টেবিলে বসল।

চমকে উঠল রহমান, কিন্তু সে ভয় পেল না। কারণ সে জানে, তাদের সর্দার সবচেয়ে বড় জুয়াড়ী। রহমান গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে, দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল কেউ যেন তার সর্দারকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

খেলা চলছে।

রাত বেড়ে আসছে।

একি! সর্দার বার বার হেরে যাচ্ছে। এক হাজার, দু'হাজার তিন হাজার—দশ হাজার।

রহমানের চোখে ধাঁধা লাগছে। এতবার হেরেও তার সর্দার হাসিমুখে খেলে যাচ্ছে-ব্যাপার কি? সর্দার তো কোন দিন পরাজিত হয় না, হলেও তা সে কোন সময় স্বীকার করেন না। জিততেই হবে তার। তারপর টাকা হাতে পেয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেবে তাদেরই মধ্যে তবুও পরাজয়ের কালিমা মুখে মাখবে না। রহমান বুঝতে পারে, ইচ্ছা করেই সর্দার আজ পরাজয়ের কালিমা বরণ করে নিচ্ছে।

বনহুরের নিকটে হাজার হাজার টাকা জিতে নিয়ে দুষ্ট লোকগুলো খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, সবাই বনহুরকে পিঠ চাপড়ে দিল।

নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসতেই রহমান বলল—সর্দার, আজ আপনি এমনভাবে নিজেকে-----কথা শেষ না করে মাথা চুলকাতে লাগল সে।

বনহুর বুঝতে পারল কি বলতে চায় রহমান। বনহুর এবার শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল—উপস্থিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য টাকাগুলো ওদের হাতে তুলে দিলাম।

সর্দার!

জানি মৃত্যু সহজ নয়, তবু------যাক রহমান, সেজন্য তুমি ভেব না। জান আজ আমি একটা মস্তবড় সমাধান খুঁজে পেয়েছি। নাও শুয়ে পড় নিশ্চিন্তে। আর কেউ আমাদের আক্রমণ করবে না।

কিন্তু সর্দার, আমার যে চোখে ঘুম আসবে না।

কেন?

এখনও বাথরুমে লাশটা....

ভয় নেই, ও আর জাগবে না। নাও ঘুমাও।

গায়ে চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

রহমানও শুয়ে পড়ল।

❑

এখানে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো সুফিয়া? বলল বিনয় সেন।

সুফিয়া আজ ক'দিন হল এই বজরায় আশ্রয় পেয়েছে, তারপর থেকে সুফিয়া কোন সময়ের জন্য এতটুকু কষ্ট বা দুঃখ পায়নি। এত সুখ বুঝি তার নিজের বাড়িতেও পায়নি। বিনয় সেনের কথায় বলল সুফিয়া—ভাইজান, আপনার দয়ায় আমি যে কত সুখে আছি তা মুখে বলার ভাষা আমার নেই। অনেক ভাল আছি আমি।

বিনয় সেন এবার বলল–জানি, তোমার মনে একটা কষ্ট অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে হচ্ছে তোমার পিতামাতার নিকটে যাবার ইচ্ছা। বিনয় সেন হেসে বলল—দুঃখ করনা বোন, জানত দুঃখের পর সুখ.....

সে আমি জানি, আপনার মত ভাইজান পেয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে।

সুফিয়া, এবার শুয়ে পড়; রাত অনেক হল।

ভাইজান, আজ একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, জবাব দেবেন তো?

আজ নয় বোন, অন্য দিন তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে তার জবাব পাবে। আজ চলি, ঘুমাও বোন।

আচ্ছা যান আপনি। সুফিয়া বিনয় সেনকে বিদায় দিল।

বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে চলে গেলেও সুফিয়া ঘুমাতে পারল না। আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে এল এই বজরায় আশ্রয় নিয়েছে সে। কিন্তু বজরায় তার কক্ষেই এসে বিনয় সেন সাক্ষাৎ করে যায়। একটি চাকর আছে–সেই খাবার দিয়ে যায়, অন্যান্য যা প্রয়োজন সব সেই চাকরটাই এনে দেয়। এমন কি এখানে তার শাড়ি, জামা-কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী সব সে পেয়েছে। কোন অভাবই সে অনুভব করেনি বজরায় বাস করে।

কিন্তু আশ্চর্য, বিনয় সেনকে আজও ভাল করে জানতে পারল না সে। অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা করেও মানুষ এত সৎ, এত মহৎ হতে পারে।

নানা চিন্তায় সুফিয়া মগ্ন হয়ে পড়ে। ঘুম তার চোখে আসছে না।

রাত অনেক হয়েছে।

হঠাৎ একটা শিস দেবার শব্দ সুফিয়ার কানে এসে পৌঁছল, চমকে উঠল সুফিয়া–একবার, দু'বার তিনবার ঐ রকম শব্দ। তারপর তার ভাইজান বিনয় সেনের কক্ষের দরজা খোলার শব্দ শুনা গেল।

সুফিয়া আজ স্থির থাকতে পারল না, সে চুপি চুপি নিজের বজরার দরজা সামান্য ফাঁক করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বিনয় সেন তখন বজরার সিঁড়ি বেয়ে নদীতীরে নেমে যাচ্ছে।

সুফিয়া চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল বিনয় সেনকে।

নদীতীরে দু'টি লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে, এটাও লক্ষ্য করল সুফিয়া।

বিনয় সেন নদীতীরে পৌঁছতেই লোক দু'টি অভ্যর্থনা জানাল। বজরা থেকে নদীতীর মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। কথাবার্তা সব শোনা যাচ্ছে।

বিনয় সেন বলল—কি হলো, খবর কি!

লোক দু'টির একজন বলল—হুজুর, হেমাঙ্গিনী রাজী হতে চায় না বলে তার ওখানে নতুন মানুষ নিয়ে যাওয়া চলবে না। যেমন খুশি মেয়ে সে আপনাকে দিতে রাজী আছে, যত খুশি পাবেন।

সুফিয়া শিউরে উঠল, নদীতীরের লোকগুলোর কথাবার্তা সব সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। দেব সমতুল্য বিনয় সেনও হেমাঙ্গিনীর শরণাপন্ন। এমন লোকও চরিত্রহীন.... ঘৃণায় সুফিয়ার মন বিষিয়ে উঠল—ছিঃ ছিঃ মানুষ চেনা কঠিন!

এবার কানে ভেসে আসে বিনয় সেনের কণ্ঠ—আমাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। যত টাকা চায় তাই দেব কিন্তু আমার মনমত নারী চাই।

সুফিয়া আর দাঁড়াতে পারল না, মাথাটা তার ঝিম ঝিম করে উঠল, এমন লোকের বজরায় সে বাস করছে। না না, এখানে থাকা আর চলবে না, এমন লোকের বিশ্বাস কি!

এক সময় লোকগুলো চলে গেল।

বজরায় ফিরে এল বিনয় সেন।

পাশের ক্যাবিনে বসে সব টের পেল সুফিয়া। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল গত পনেরটা দিনের কথা। কই একটি দিনও তো বিনয় সেন তার সঙ্গে কোন অসৎ আচরণ করেনি! একা নিঃসঙ্গ পেয়েও কোনদিন এতটুকু কুৎসিত ইংগিত করেনি। আপন বোনের মতই স্নেহ করেছে, ভালবেসেছে সে তাকে!

অনেক ভেবেও সুফিয়ার মন স্বচ্ছ হল না, নিজ কানে সে বিনয় সেনের উক্তিগুলো শুনেছে। ঘৃণায় সুফিয়ার মন তিক্ত হয়ে উঠল।

পরদিন যখন বিনয় সেন সুফিয়ার কামরায় এল তার সঙ্গে দেখা করতে তখন সুফিয়া কিছুতেই বিনয় সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারল না। কিছুতেই সে চোখ দুটো তুলে ধরতে পারল না বিনয় সেনের মুখে।

সুফিয়ার আচরণে বিস্মিত হল বিনয় সেন, ভেবে পেল না কি হয়েছে তার।

বিনয় সেন প্রশ্ন করলো—সুফিয়া, তোমার কি কিছু হয়েছে?

সুফিয়া নীরব রইলো, কোন জবাব দিল না।

বিনয় সেন আরও সরে এল সুফিয়ার পাশে, মাথায় হাত বুলিয়ে সন্দেহে বলল–আজ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তোমার। ছিঃ, অমন নিশ্চুপ রইলে কেন, বল কি হয়েছে?

সুফিয়া আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল—কি বলবে সে! যা সে নিজ কানে শুনেছে, জেনেছে তা বলার নয়। তবু বলল সুফিয়া—কিছু হয়নি।

বিনয় সেন বলল–মিথ্যে কথা। আমায় লুকোচ্ছ তুমি। ছিঃ আমার কাছে লুকোতে নেই বোন, বল কি হয়েছে তোমার?

আমি এখানে আর থাকতে চাই না।

কেন, কেন বল? ব্যস্তকণ্ঠে বলল বিনয় সেন!

সুফিয়া এবার মুখ তুলে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না সুফিয়া, নীল উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ----কই, সে চোখ দু'টিতে নেই কোন লালসাপূর্ণ চাহনি। পবিত্র নির্মল একটি বলিষ্ঠ মুখ-----হেসে বলল বিনয় সেন–কি দেখছ সুফিয়া?

সুফিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—ভাইজান, আমাকে মাফ করুন ভাইজান। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

বিনয় যেন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল—কি হল বোন। নিশ্চয়ই তোমার এমন কিছু ঘটেছে যা তোমার মনে অসহ্য বেদনা দিচ্ছে। বল কি হয়েছে?

সুফিয়া দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে বলে উঠল–আমাকে মাফ করে দিন ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

সেকি সুফিয়া!

হ্যাঁ ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আপনার ফেরেস্তার মত চরিত্র---না না, তা হতে পারে না। ভাইজান, আপনি মানুষ নন, ফেরেস্তা।

সুফিয়া, তোমার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য তুমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছ, আমাকে খুলে বল সুফিয়া?

না না, সে কথা বলতে পারব না ভাইজান। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কিন্তু বনহুর নিজের কামরায় গিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না, কি ঘটেছে, যার জন্য সুফিয়া তার সংগে প্রথমে কথাই বলল না– পরে কাঁদল, কি সব আবোল তাবোল বলল, ক্ষমা চাইল, লজ্জার কথা, বলা চলবে না। এসব হেঁয়ালি ভরা কথা—কিছুই বুঝতে পারে না বিনয় সেন।

এরপর থেকে বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষে যাওয়া বন্ধ করে দিল, দূরে থেকে সুফিয়ার সুবিধার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সুফিয়া ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, সেদিনের ঘটনার পর বিনয় সেন তাকে যথেষ্ট এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। যদিও এতে সুফিয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তবু মনে শান্তি ছিল না তার। কারণ, আজ সে কোথায় থাকত, কেমন থাকত কে জানে। তার অপবিত্র দেহটা যে এতদিনে শিয়াল কুকুরে খেত না, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে! ছিঃ ছিঃ কেন সেদিন সুফিয়া তার সঙ্গে অমন আচরণ করেছিল, যার জন্য অমন ফেরেস্তার মত লোকের মনে একটা গভীর সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে। সুফিয়া নিজেকে বড়ই লজ্জিত মনে করে।

❑

হেমাংগিনী দেবী তার বিশাল বপু নিয়ে কেবলমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় গোপীনাথ তার কক্ষে প্রবেশ করে আদাব জানাল।

গোপীনাথকে লক্ষ্য করে বলল হেমাংগিনী—এসেছে নাকি লোকটা?

হাঁ দিদি—এসেছেন তিনি।

দেখ বুঝে-সুঝে কাজ কর, আমার কারবার যেন নষ্ট হয়ে না যায়, তাহলে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না।

সে তো আমি জানি দিদি, আমি কি আর বুদ্ধিহীন। সব দিক ভেবেচিন্তে তবেই কাজ করি।

যাও, বকবক কর না, নিয়ে এস।

আচ্ছা দিদি, এক্ষুণি আনছি।

এই শোন, টাকা-পয়সা কিন্তু একসিকি কম নেব না।

আরে ছোঃ পয়সা কম দেবেন বিনয় সেন, উনি তাহলে রাজকর্মচারী হলেন কেন! বেরিয়ে গেল গোপীনাথ।

একটু পরেই কক্ষে প্রবেশ করলো গোপীনাথ—সংগে বিনয় সেন।

হেমাংগিনী বিনয় সেনকে লক্ষ্য করেই আনন্দে আটখানা হল। বহু লোককে সে জীবনে দেখেছে, জেনেছে.-----কত লোকই না আসে তার এখানে-কত রাজা মহারাজা, কত নবাব বাহাদুর, কত জমিদার, কত প্রজা, কিন্তু এমন সুন্দর চেহারার লোক তো সে কোনদিন দেখেনি। সবাই আসে হেঁইয়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ী। কেমন উদ্ভট চেহারা। কেমন নেশায় ঢল ঢল, জড়িত কণ্ঠস্বর-আর এ যে একেবারে যুবরাজ।

হেমাংগিনী সকলের অজ্ঞাতে নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল। আঁচলটা যুবতী মেয়েদের মত মাজায় গুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল এবার-আপনার নামই বুঝি----

হাঁ, আমার নামই বিনয় সেন। আর আপনি বুঝি হেমাংগিনী দেবী?

কোন জবাব না দিয়ে আঁচলের ডগাটা দাঁতে কামড়ে যুবতীদের অনুকরণে মাথাটা দোলাল।

বিনয় সেন বলল—চলুন, যে কারণে এসেছি------

হেমাংগিনী বাঁকা চোখে একটু টিপ্পনী কেটে বলল-এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। সব পাবেন, বসুন না একটু।

বিনয় সেন আসন গ্রহণ করল।

হেমাংগিনী এবার গোপীকে লক্ষ্য করে বলল—তুমি আবার অমন হা করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাওনা বেরিয়ে। বখশিস যা দেবার পরে দেব, যাও।

হেমাংগিনী কথাগুলো মোলায়েম সুরেই বলে যেতে চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎ তার আসল কণ্ঠ বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে চট করে গলার আওয়াজ মোলায়েম করে নিয়ে বলল—ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ ঠিক থাকে না, আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

না না, কিছু মনে করিনি।

গোপীনাথ ততক্ষণে কক্ষ ত্যাগ করেছিল।

বিনয় সেনের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে একটা পর্বতের পাশে যেন বসে আছে সে। অস্বস্তি বোধ করলেও মুখোভাব স্বাভাবিক রেখে বলল বিনয় সেন—হেমাঙ্গিনী দেবী?

বলুন?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সত্যি!

হাঁ সত্যি, আপনার মত মেয়ে আমি কোথাও দেখেছি কিনা সন্দেহ।

এ্যাঁ কি বললেন?

মানে আপনার মত সুন্দরী মেয়ে-------

সত্যি!

সত্যি নয়তো কি মিছে বলব, তবে আপনার শরীরটা যদি একটু সরু হত তাহলে আপনাকে স্বর্গের অপ্সরী বললে ভুল হত! আহা, কি সুন্দর আপনার চোখ দুটো------

সত্যি!

হাঁ, আপনার ঠোঁট দু'খানা অতি সুন্দর। আপনার ভুরু যেন রামধনু। গোলাপের পাপড়ির মত আপনার চোখের পাতা---

বিনয় সেনের কথায় হেমাঙ্গিনী মোমের মত গলে যাবার উপক্রম হয়। সে পৃথিবীতে আছে না স্বর্গে গেছে ভাবতে পারে না। প্রেম গদগদ হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে।

বিনয় সেন ভেতরে ভেতরে বিপদ গুণলেও মুখে হাসি টেনে বলল—চলুন, মেয়েদের কোথায় রেখেছেন দেখাবেন চলুন।

এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বিনয় বাবু? আমার কাছে বসতে বুঝি মন চাইছে না?

ছিঃ ছিঃ ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না হেমাঙ্গিনী দেবী। আপনাকে দেখা অবধি আমি-----আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছি না।

সত্যি বলছেন তো?

আমি মিথ্যা বলি না কোনদিন।

তবে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

ব্যস্ত হইনি তবে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিনা, পরের চাকরি করি!

আচ্ছা বিনয় বাবু রাজবাড়িতে আপনাকে কত মাইনে দেয়– অবশ্য মনে যদি কিছু না করেন তবেই বলুন?

না না, এতে আবার মনে করার কি আছে? তা রাজবাড়িতে চাকরি করে মাসে পাঁচ শ' টাকা পাই।

ছিঃ ছিঃ এই সামান্য মাইনেতে আপনি কাজ করেন সেখানে?

তাছাড়া আর যে আমার কোন উপায় নেই হেমাঙ্গিনী দেবী।

তবে যে গোপী আমাকে বলেছিল আপনি নাকি অনেক টাকার মালিক?

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, যদিও আমি চাকরি করি মাত্র সামান্য টাকায় কিন্তু আমার বাবার অনেক বিষয়-আসয় আছে কিনা। বছরে লাখ দেড় লাখের উপরে পাই।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, হেসে বলল—তাহলে চাকরি করার কি দরকার?

ওটা আমার নেশা! বসে থেকে আমার সময় কাটতে চায় না।

তাই চাকরি করি।

আচ্ছা বিনয় বাবু?

বলুন হেমাঙ্গিনী দেবী?

একটা কথা বলব?

স্বচ্ছন্দে বলুন–একটা কেন, হাজারটা বলুন। আপনার কণ্ঠস্বর আমার কানে সুধা বর্ষণ করছে।

সত্যি তো?

একবারই বলেছি মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

আপনি বড় ভদ্র, আপনার মত লোক আমি কোনদিন দেখিনি।

দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিনয় সেন–সেই কারণেই তো আপনি এমন ফেঁপে উঠেছেন....

কি বলেন বিনয় বাবু?

না না, ও কিছু নয়—মানে আপনি বড় অমায়িক মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

হাঁ, আমি লক্ষ্মীই বটে, নইলে দেখছেন না কত বড় বাড়ি, গাড়ি হাজার হাজার কর্মচারী আমার কাজ করছে। শহরে মস্তবড় একটা হোটেল আছে, নাম শুনেছেন বুঝি জানবাগ হোটেলের?

হাঁ শুনেছি, কিন্তু এখনও সেখানে যেতে পারিনি, এটা আমার দুর্ভাগ্য!

ছিঃ ছিঃ, এজন্য দুঃখ করবেন না বিনয় বাবু। আপনাকে আমি সব দেখাব, সব দেখাব–আমার বাড়ির কোথায় কেমন পরিবেশ, সব দেখাব। ও, যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা একেবারে ভুলেই গেছি। বলছিলাম কি জানেন?

বলুন?

মানে আপনি রাজবাড়িতে যখন মোটে পাঁচ শ' পান, আমি যদি আপনাকে তার ডবল দেই মানে এক হাজার?

বিনয় সেন খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল–এ অধমের প্রতি এত দয়া!

হেমাঙ্গিনী প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলল—অধম নন আপনি। আপনি অতি ভাগ্যবান। এক হাজার কেন, আমি আপনাকে আমার যথাসর্বস্ব দেব—অনেক দেব—রাজপুত্রের মত করে রাখব।

বিনয় সেন বিপদ গুণল, হেমাঙ্গিনী তার প্রেম ভিখারিণী। এখন উপায়? যে কাজে সে এখানে এসেছে সব বুঝি পণ্ড হল!

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল—চলুন!

কোথায় যাবেন বিনয় বাবু?

আমি যে কারণে এসেছি।

ও, এখনও আপনি ঐ কথাই ভাবছেন? বেশ চলুন, কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে।

বলুন।

আপনাকে সেখানে ছদ্মবেশে যেতে হবে।

কেন? অবাক কণ্ঠে বলল বিনয় সেন।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হেসে বলল—আপনার ঐ সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহারা দেখলে আমার সবগুলো মেয়েই....

ও, বেশ তো আমি ছদ্মবেশেই যাব।

আসুন আমার সঙ্গে।

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনকে নিয়ে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। বিনয় সেন বেশ ঘাবড়ে উঠছিল, হেমাঙ্গিনী আবার তাকে এখানে নিয়ে এল কেন।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল—এটা আমার ছদ্মবেশ কক্ষ! এখানে আপনি ইচ্ছামত চেহারা পালটে নিতে পারেন। চলে যাচ্ছিলো হেমাঙ্গিনী, পুনরায় ফিরে এসে বলল—শুনুন, আপনি কিন্তু বেশ বুড়োর ড্রেস পরে নেবেন।

আচ্ছা। হেসে বিনয় সেন দরজা বন্ধ করল।

ড্রেসিং কক্ষ থেকে যখন বিনয় সেন বের হলো তখন সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। যদিও তার চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে, তবু তাকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন কোন সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ-দাড়ি রুচিসম্মত। শরীরে পাজামা আর পাঞ্জাবী। হাতে রূপোর বাঁটওয়ালা ছড়ি।

হেমাঙ্গিনীর সামনে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন।

খুশি হলো হেমাঙ্গিনী, আনন্দভরা কণ্ঠে বলল—হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে।

বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীকে অনুসরণ করল।

হেমাঙ্গিনী তার বিশাল বপু নিয়ে হাতির মত দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল আর বিনয় সেন চারদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার পেছনে পেছনে এগুতে লাগল।

নারীহরণকারীদের গোপন আস্তানাই বটে। বাড়িটা বহুকালের পুরান হলেও এখনও কোথাও ভেঙ্গে খসে পড়েনি বা ধ্বসে যায়নি।

অনেকগুলো কক্ষ পেরিয়ে হেমাঙ্গিনী একটা ছোট্ট কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দিনের বেলাও বেশ অন্ধকার। হেমাঙ্গিনী সুইচ টিপে আলো জ্বালল। এবার বিনয় সেন দেখল কক্ষটা সিঁড়িঘর।

বেশ সরু ধরনের একটা সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। হেমাঙ্গিনী আর বিনয় সেন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়িটা বেশ ঘুরে ঘুরে নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়িতেও আলো ছিল। কাজেই নামতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না বিনয় সেনের।

সিঁড়িমুখে পৌঁছে হেমাঙ্গিনী দেবী থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির শেষে একটা দরজা রয়েছে। দরজায় মস্তবড় একটা তালা আটকান। হেমাঙ্গিনী কোমর থেকে একগোছা চাবি বেছে নিল, তারপর তালাটা খুলে ফেলল। বিনয় সেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিন্তু কক্ষটা জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখতে পেল না সে। হেমাঙ্গিনী এবার বিনয় সেনকে তার সঙ্গে আসার জন্য ইংগিত করল।

বিনয় সেন বলল—ঐ অন্ধকারে কোথায় যাব হেমাঙ্গিনী দেবী?

আসুন, আলো জ্বেলে দিচ্ছি। হেমাঙ্গিনী অন্ধকারে প্রবেশ করে দরজার পাশেই দেয়ালে হাত রেখে সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটা আলোময় হলো।

বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেল, কক্ষের ওপাশে আর একটা লোহার দরজা, সেই দরজাতেও মস্তবড় একটা তালা লাগান।

হেমাঙ্গিনী এ তালাটাও পূর্বের ন্যায় অতি স্বচ্ছন্দে খুলে ফেলল।

হেমাঙ্গিনীর সংগে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হল কয়েকটা যুবতীকে সেই কক্ষে দেখতে পেল। কেউ বা বসে কেউ বা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। চোখ বসে গেছে। কেউ কেউ নীরবে কাঁদছে।

হেমাঙ্গিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল বিনয় সেন। হেসে বলল হেমাঙ্গিনী—এখন এই ক'টা মাত্র আছে বিনয় বাবু। বাকীগুলো চালান হয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই যে যুবতীগুলো বিছানায় শুয়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল। সকলের মুখেই ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ছাপ। ভয়ে আড়ষ্ট হয় সবাই। বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীর পাশে

দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল! বিনয় সেন বেশ বুঝতে পারল যুবতীগণ তাদের আগমনে ভীত হয়ে পড়েছে–না জানি কার এবার বিপদ আসবে!

বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী....পছন্দ হয়?

বিনয় সেন ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল—উঁ হুঁ।

এ কথায় হেমাঙ্গিনী যেন খুশি হয়েছে বলে মনে হল, বলল সে—একটিও না?

বিনয় সেন কোন জবাব না দিয়ে প্রতিটি মেয়ের মুখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল। একটি মেয়ে তখনও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

বিনয় সেন তার দিকে এগুলো।

হেমাঙ্গিনী অমনি বিনয় সেনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। দেখা তো হল, কোন্‌টা চাই বলুন বিনয় বাবু?

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে তাকাল ঐ যুবতী, যে এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। যুবতী অন্য কেউ নয়, দস্যু বনহুরের প্রিয়তমা–মনিরা।

যুবতী মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বিনয় সেন ওকে লক্ষ্য করল—চমকে উঠল সে—মুগ্ধ হল, এত সুন্দরী যুবতী রয়েছে এখানে!

হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারল, বিনয় সেনের দৃষ্টি মনিরার ওপর পড়েছে। হেসে বলল—ওকে বুঝি পছন্দ হল?

বিনয় সেনের দাড়িভরা মুখে হাসি ফুটে উঠল, মাথা দুলিয়ে বলল—খুব পছন্দ হয়েছে!

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের কানে মুখ নিয়ে বলল—নাগরাণী!

তার মনে?

মানে ওকে কেউ বাগে আনতে পারে না। সুন্দরী বলে সবাই ওকে পছন্দ করে কিন্তু পরে জান বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ে। একজনকে সে খুন করেছে, দু'জনকে করেছে আহত।

তাই নাকি?

হাঁ, সেই কারণেই তো আজও পড়ে আছে। ওর পরে কত এলো কত গেল, তবু সে রয়েছে! এখন যে আসে তার কাছে মূল্য বেশি চাই, কাজেই নিতে পারে না, আমিও খুনের হাত থেকে বেঁচে যাই!

তাহলে তো অমন মেয়েই আমার দরকার। নিরীহ মেয়ে আমার ভাল লাগে না, যেমন আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়। আচ্ছা হেমাঙ্গিনী, ওর জন্য আপনাকে কত দিতে হবে?

তা আপনাকে... মানে আপনার যা খুশি দেবেন।

বিনয় সেন মৃদু হেসে বলল—বিশ হাজার।

এত বেশি!

তার চেয়েও বেশি দিতে রাজী আছি হেমাঙ্গিনী দেবী।

বেশ, কিন্তু দেখবেন খুন-জখম না হয়ে বসেন!

মরতে যখন একদিন হবেই তখন ওসবে আমার ভয় নেই। তা টাকাটা কখন দিতে হবে?

যখন আপনার খুশী।

এই নিন টাকা, আমি সঙ্গেই এনেছি। পকেট থেকে হাজার টাকার কয়েক খানা নোট বের করে হেমাঙ্গিনীর সামনে বাড়িয়ে ধরল।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে জ্বলজ্বল করে—একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা! হেমাঙ্গিনীর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে জামার ফাঁকে বুকের কাছে রাখল।

মনিরা তখন সব বুঝতে পেরেছে, এবার তারই পালা। চোখে মুখে ফুটে উঠল তার একটা প্রতিহিংসার হিংস্র ভাব।

হেমাঙ্গিনী এবার মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, গলার স্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলল—উনি মস্ত বড়লোক; তোমাকে রাজরাণী করে রাখবেন, যাও-যাও তুমি!

না, যাব না।

কেন বাছা আমাকে বারবার জ্বলচ্ছে? উনি ভদ্র সন্তান, উনি মস্ত ধনবান, উনি অনেক জ্ঞানবান।

তবু আমি যাব না।

দেখ মেয়ে, তুমি আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছ, তোমার জন্য আমার অনেক টাকা লোকসানও গেছে। এবার আমি তোমাকে রেহাই দেব না।

আমি যাব না।

তিলে তিলে তোমাকে শুকিয়ে মারব।

মরতেই চাই আমি।

মরতে চাইলেই মরতে দেব? আমার টাকাগুলো জলে ভেসে যাবে, তা হচ্ছে না বাছাধন... এবার বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী–আপনার গাড়ি?

বিনয় সেন বলল–বাইরে অপেক্ষা করছে।

হেমাঙ্গিনী হাতে তিনটা তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা যমদূতের মত ভীষণ আকার লোক এসে দাঁড়াল। মনে হলো যেন পাতালপুরী রাজ্য থেকে এল ওরা। হেমাঙ্গিনী বললো– বাইরে অন্ধকারে যে গাড়িটা অপেক্ষা করছে সেইগাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

ভয়ঙ্কর লোক তিনজন এগুলো মনিরার দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ভয়ার্ত বিবর্ণ হয়ে উঠল, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সে।

ভয়ঙ্কর লোক তিনটা যেমনি মনিরাকে ধরতে গেল, অমনি মনিরা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল–না, না, আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে তোমরা স্পর্শ কর না।

লোক তিনটা তবু পাকড়াও করার জন্য হাত বাড়াল মনিরার দিকে।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল–দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দাও।

বিনয় সেন বলে উঠল–থাক, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই, তোমরা সরে দাঁড়াও। বিনয় সেনের কথায় লোক তিনটি থমকে দাঁড়াল।

বিনয় সেন এবার মনিরার দিকে এগুলো।

মনিরা তাকাল বিনয় সেনের দিকে। দু'চোখে ওর ঝরে পড়ছে ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব।

বিনয় সেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে খপ্ করে মনিরার হাত মুষ্ঠিতে চেপে ধরল।

মনিরা অমনি হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু একচুলও হাত নড়াতে পারল না। বিনয় সেন অতি সহজেই মনিরাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

হেমাঙ্গিনী হতবাক হল, যে যুবতীকে একসঙ্গে তিন-চার জন বলিষ্ঠ লোক এতটুকু নড়াতে পারে না, আর কিনা একজন লোক তাকে এভাবে নিয়ে যেতে পারল।

বিনয় সেন মনিরাকে গাড়িতে তুলে নিতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। মনিরা তখনও নিজেকে বিনয় সেনের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। গাড়িতে বসেই বিনয় সেন মনিরার মুখে একটা রুমাল বেঁধে দিল যেন সে চিৎকার করতে না পারে। তবু মনিরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি করছে দেখে বিনয় সেন তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

গাড়ি চালাচ্ছিল গোপীনাথ।

গাড়ি ছাড়ার পূর্বে গোপীনাথ বিনয় সেনকে জিজ্ঞাসা করল— কোথায় যাবেন হুজুর? রাজবাড়িতে আপনার বাসায়, না আপনার বজরায়।

বিনয় সেন বলল—আমার বজরায়।

গাড়ি শহর ছেড়ে বাইরের পথ ধরে ছুটে চলল।

বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে বিদায় হতেই হেমাঙ্গিনী অন্যান্য মেয়ের দিকে একবার সতৃষ্ণ নজরে তাকাল—এদের বিক্রি করে আর কত হাজার পাওয়া যেতে পারে, এটাই বুঝে ভেবে নিল সে। তারপর কক্ষের দরজায় তালা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নিজের কক্ষে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টাকাটা অন্য সময় সুযোগ বুঝি গুণে দেখবে, এখনকার মত রেখে দিল লোহার সিন্দুকে।

হেমাঙ্গিনীর আনন্দ আজ আর ধরে না, আজ তার বাঈজী জীবন সার্থক হয়েছে। বিনয় বাবুর মত একজন সুপুরুষ যুবক তার রূপের প্রশংসা করেছে। আর একটু হলেই তারই প্রেমে পড়ে যেত বিনয় বাবু, কিন্তু ঐ ছুঁড়িটাই আর বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যাক, তবু তো একসঙ্গে এতগুলো টাকা। হেমাঙ্গিনী আজ নাচতে শুরু করে, জোয়ান থাকতে অনেক সে

নেচেছে, কিন্তু সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। এখনও সে বেশ নাচতে পারত, শুধু শরীরটায় যা মেদ হয়েছে, পা দু'খানা যেন আর নড়তে চায় না এই যা!

❑

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে নিজের বজরায় প্রবেশ করল। মনিরার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। মুখেও রুমাল বাঁধা। কাজেই মনিরা চিৎকার বা নড়াচড়া করতে পারছিল না। অসহায় মনিরার বুকের মধ্যে ঝড় বইছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। এই দুষ্ট শয়তানের কবল থেকে কি করে নিজেকে রক্ষা করবে সেই চিন্তা করতে লাগল। ভাবছে মনিরা—এবার আর আর রক্ষা নেই, এই বুঝি তার জীবনের শেষ পরিণতি। সে নীড়হারা কপোতীর ন্যায় থর থর করে কাঁপছে।

বিনয় সেন মনিরাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে ওর হাতের এবং মুখের বাঁধন খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা সরে দাঁড়াল একপাশে। দু'চোখে তার ঝরে পড়ছে সর্পিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে, দাঁতে অধর দংশন করে সে।

বিনয় সেন মনিরার দিকে এগুলো না বা তাকে পাকড়াও করলো না, নিস্পন্দ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা অবাক হল লোকটা তার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন। রাগও হলো মনিরার, সে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বিনয় সেন তখনও স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। মনিরার হৃৎপিণ্ড ঢিপ ঢিপ করছে, এই বুঝি তার ওপর হামলা করে বসল, বেশ কিছু সময় কেটে গেল এখনও তো লোকটা কিছু বলছে না বা তাকে কোন রকম বিরক্ত করছে না। ব্যাপার কি? মনে মনে কিছুটা সাহস হল মনিরার, আবার সে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। একি এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই লোকটা ভাবছে কোন কথা। হয়ত অনুরোধ জানালে মায়া হতে পারে। হাজার হলেও

বুড়ো মানুষ তো, পিতার বয়সী। কিন্তু এতগুলো টাকা সে আমার জন্য দিয়েছে, এত সহজে ছাড়বে? তবুও যার হৃদয় বলে কিছু আছে সে কোনদিন এত জঘন্য বা হৃদয়হীন হতে পারে না।

মনিরা নিজেকে রক্ষার জন্য ওর পায়ে ধরবে তবুও যদি সে পরিত্রাণ পায়। এবার মনিরা ছুটে গিয়ে বিনয় সেনের পা জড়িয়ে ধরল—আমাকে বাঁচান....

বিনয় সেন মনিরাকে দু'হাতে বাড়িয়ে তুলে নিল, গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলল—ভয় নেই, আমি তোমাকে কোন দুষ্ট মতলবে নিয়ে আসিনি।

মনিরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে।

বিনয় সেন বলল—আমি তোমাকে ঐ নর-পিশাচিনীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই এভাবে নিয়ে এলাম।

মনিরা এবার বলে উঠল—আপনি এত টাকা আমার জন্য নষ্ট করলেন!

নষ্ট নয়, ও টাকা আমার সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে। তোমাকে দেখে আমার বড় মায়া হল তাই----বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল বিনয় সেনের কণ্ঠ।

মনিরার দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন, বলল সে—আপনার এ উপকারের কথা জীবনে ভুলব না। জানি না আপনি কে—আপনার পরিচয়ই বা কি, তবু আপনার মহৎ হৃদয়ের যে পরিচয় পেলাম কোনদিন তা আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

বিনয় সেন এবার বলল—যদিও আমি ঝিন্দ শহরে বাস করি কিন্তু আমি ঝিন্দের অধিবাসী নই, আমি বিদেশী। আমার নাম বিনয় সেন। উপস্থিত আমি রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত রয়েছি। হাঁ, তুমি আমার এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার। পাশের কামরায় তোমার মত আর একজন রয়েছে, সেও হারানো, রিক্তা। আচ্ছা এবার বল তোমাকে কোথায় পৌঁছে দিলে তুমি নিরাপদ হতে পারবে?

মনিরা কিছুক্ষণ বিষণ্ন বদনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলল—কোথায় যাব জানি না।

বলো, তোমার বাবা-মা স্বামী?

সব হারিয়ে আমি, আজ আমি সর্বহারা।

ভয় দুঃখ করতে নেই, তুমি বস, বসে স্থির হয়ে কথা বল।

বসলো মনিরা। কতদিন পর আজ মনিরা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি?

আমার নাম মনিরা।

কোথায় বাড়ি তোমার?

কান্দাই শহরে।

সে তো এখান থেকে বহু দূরে।

হ্যাঁ।

সেখানে তোমার কে আছেন?

আমার কেউ নেই, এক মামীমা আছেন।

বেশ, সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখ মনিরা, আমার কাছে তুমি কিছু লুকাবে না, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।

হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মত হৃদয়বান এ বিশ্বে বুঝি কেউ নেই।

আচ্ছা মনিরা, তোমার একমাত্র মামীমা ছাড়া আর কি কেউ নেই?

সব ছিল, আজ নেই।

তোমার বাবা-মা?

মারা গেছেন।

তোমার ভাই-বোন?

ছিল না।

তোমার স্বামী?

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে পড়ল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল—স্বামীর কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হয়েছি।

অবিশ্বাসিনী!

হ্যাঁ, আমার স্বামীর মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ প্রবেশ করেছিল তারপর থেকে তিনি আর আমার সন্ধান নেননি।

এত হৃদয়হীন তোমার স্বামী! মিথ্যা সন্দেহ করে তোমার মত স্ত্রীর প্রতি যে অবিচার করতে পারে–

না না, আমার স্বামী হৃদয়হীন নন, তিনি অতি মহৎ, অতি মহান-----

নারীমন অমনই হয়, নারীর কাছে স্বামী পরম গুরু তাই তার সকল দোষ স্ত্রীর নিকট মার্জনীয়। কিন্তু আমার কাছে তোমার স্বামী এক পাপীষ্ঠ— শুধু পাপীষ্ঠই নয়— নরপিশাচ-------

না না, ওসব কথা বলবেন না। আমি সব সইতে পারি সব কষ্ট বুক পেতে নিতে পারি কিন্তু আমার স্বামীর নামে কোন কথা সইতে পারি না---

মনিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিনয় সেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

অনেকক্ষণ কাঁদল মনিরা, তারপর বুকের ভার কিছুটা যেন লাঘব হল, একটু সোজা হয়ে বসল—আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলল—আমার স্বামীর কোন দোষ নেই, তিনি যে মুহূর্তে যেমন কথা শুনেছেন তাতে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি আমার গুরুজন তাই আপনার নিকট আমি সব বলছি —আমার এক ছেলে জন্মেছিল। দুর্ভাগ্য, সন্তানটি যখন আমার পেটে আসে তার কয়েক দিন পরই আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হন। তারপর আবার তার সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ ঘটে তখন আমার কোলে নবজাত শিশু। এবং যে মুহূর্তে আমার সঙ্গে আমার স্বামীর প্রথম সাক্ষাৎ হল সে মুহূর্তে এক দুষ্ট ব্যক্তি আমার সন্তান সম্বন্ধে কুৎসিত ইংগিত করেছিল, কাজেই তিনি ভুল করেননি।

বিনয় সেন বলল—কিন্তু লোকের কথা শুনেই ওভাবে তোমাকে তার ত্যাগ করা উচিত হয়নি।

ত্যাগ তিনি করেননি, আমার অদৃষ্ট আমাকে এভাবে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

তোমার সন্তান এখন কোথায়?

পুনরায় মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ধরা গলায় বলল—সে নেই, এক সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে গেছে।

কে বলল এ কথা?

ঐ হেমাঙ্গিনী তাকে কাপালিক সন্ন্যাসীর নিকট বিক্রি করেছিল।

বিনয় সেনের মুখমণ্ডল ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। দু'চোখ দিয়ে যেন বের হতে লাগল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, হেমাঙ্গিনী!

হাঁ, হেমাঙ্গিনী আমাকে আরও দুবার বিক্রি করেছিল কিন্তু খোদা আমার সহায়, তাই আজও আমি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। আমি ইজ্জত বাঁচাতে নরহত্যা করেছি— নিশ্চয়ই একদিন আমার স্বামীর মনের ভুল ভেঙে যাবে। তিনি হয়তো আমার মনের কথা জানতে পারবেন, আমাকে বিশ্বাস করবেন, আমাকে গ্রহণ করবেন।

মনিরার কথায় বিনয় সেনের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনিরা বলল—আমার দুঃখে আপনি কাঁদছেন। সত্যি আমি বড় হতভাগী। নইলে অমন স্বামী, অমন সন্তান হারাব কেন?

মনিরা তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমি তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করব। তাকে সব খুলে বলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মনিরা।

মনিরা কোন জবাব দিতে পারল না।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল—আমি চললাম হেমাঙ্গিনীকে তার উচিত সাজা দিতে।

না না, আপনি যাবেন না, আপনি যাবেন না। ওর সঙ্গে পারবেন না। অনেক লোক ওর রয়েছে------

মনিরা তুমি দোয়া কর আমি সব বিপদ যেন হাসিমুখে জয় করতে পারি---কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেল বিনয় সেন।

❑

ঝিন্দ পুলিশ অফিস।

পুলিশ অফিসারগণ এবং পুলিশবাহিনীর প্রায় সকলেই ঝিন্দ অধিবাসী। সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ, মজবুত। ঝিন্দবাসীরা প্রায়ই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝিন্দাবাসী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বা পিছপা হয় না।

এমন দেশেও রয়েছে অনাচার-অবিচার অত্যাচার-উৎপীড়ন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বদা যে কত দুষ্কর্ম সাধিত হচ্ছে তার ঠিক নেই। যেমন আলোর পেছনে অন্ধকারের ঘনঘটা।

ঝিন্দ শহর অতি সুন্দর এবং মনোরম। রাজা জয়সিন্ধের ন্যায়বিচারে এখানে প্রজাগণ সুখে বসবাস করত। কিন্তু সেই ন্যায়বান রাজার অন্যায়বান পুত্র মঙ্গলসিন্ধের দুষ্কর্মে নগরবাসী হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারত না বা সাহস হত না। রাজা বিচার করতেন রাজদরবারে, আর রাজকুমার নির্যাতন চালাত লোকচক্ষুর অন্তরালে, কাজেই নগরের যত অনাচার অত্যাচার গোপনেই চলতো, বাইরে তেমনভাবে কিছু প্রকাশ পেত না।

গভীর রাত।

পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রী ধনঞ্জয় রায় এবং বড় দারোগা শ্রী বাসুদেব পুলিশ অফিসে বসে কোন গোপন ডায়েরী নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। দু'জন জমাদার ও কয়েকজন পুলিশ থানা ইনচার্জে রয়েছেন। পুলিশগণের হাতে গুলিভরা রাইফেল।

এত রাতে একখানা ট্যাক্সি এসে থামল পুলিশ অফিসের সামনে। নেমে এল বিনয় সেন, এখন তার শরীরে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশ নেই! গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুলিশ অফিসের দিকে এগুলো একদল পুলিশ জিজ্ঞাসা করল—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

বিনয় সেন জবাব দিল–রাজবাড়ি থেকে?

রাইফেল নত করে দাঁড়াল পুলিশগণ।

বিনয় সেন পুলিশ অফিসের দরজায় গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে?

বিনয় সেন জবাব দিল–আমি রাজকর্মচারী।

আসুন!

বিনয় সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করল।

রাজকর্মচারীর আগমনে ধনঞ্জয় রায় এবং বাসুদেব উঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

তারপর সকলে আসন গ্রহণ করার পর ধনঞ্জয় রায় জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাতে?

বিনয় সেন বলল— অতি গুরুতর খবর, একটা নারীহরণকারী গোপন আস্তানার সন্ধান আমি পেয়েছি।

ধনঞ্জয় রায়, বাসুদেব ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার কিছুদিন যাবৎ নারীহরণকারী দল সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছেন, কারণ ইতোমধ্যে ঝিন্দ শহরের কয়েকজন সুন্দরী তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। আজও এই ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ ধনঞ্জয় রায় ও বাসুদেবের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল! বিনয় সেনের কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ধনঞ্জয় রায়, বললেন—কি করে আপনি ঐ আস্তানার সন্ধান পেলেন?

বিনয় সেন বলল—আমার বোনকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করতে গিয়েই আমি ওদের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি। আপনারা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, এক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে নিন। আরও একটা কথা, শুধু হেমাঙ্গিনীর বাড়িতে তার কারবার সীমাবদ্ধ নয়, তার দলবল অনেকেই জানবাগ হোটেলে রয়েছে। এ হোটেলটি হেমাঙ্গিনীর।

ধনঞ্জয় রায় আদেশ দিলেন পুলিশবাহিনীকে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে।

অল্পক্ষণেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তৈরি হয়ে নিল।

ধনঞ্জয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে চললেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ি অভিমুখে, তাদের সঙ্গে রইল বিনয় সেন।

আর বাসুদেব পুলিশবাহিনীর আর একটা দল নিয়ে চললেন জানবাগ হোটেল অভিমুখে।

নিশীথ রাতের জনহীন পথ বেয়ে সশস্ত্র-বাহিনীসহ কয়েকটা মোটরকার দ্রুত ছুটে চলল।

ধনঞ্জয় রায় সেন দলবল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ির সামনে। ধনঞ্জয় রায়ের ইঙ্গিতে পুলিশবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর গোটাবাড়ি ঘেরাও করে ফেলল।

কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন ধনঞ্জয় রায়।

বিনয় সেন সেই অবসরে পথে অদৃশ্য হল।

❑

হেমাঙ্গিনী গভীর রাতে সিন্দুক খুলে টাকার অংক মিলিয়ে দেখছে। আজ তার কত টাকা সিন্দুকের টাকার সঙ্গে যোগ হল। হেমাঙ্গিনীর চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে। এতগুলো টাকার মোহ তাকে আনন্দে আত্মহারা করে তুলছে। বার বার টাকার বাণ্ডিলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গিনীর সামনে। তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলবার।

হেমাঙ্গিনী চমকে চোখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল—কে তুমি?

কঠিন অথচ চাপাকণ্ঠে বলল ছায়ামূর্তি—আমি তোমার মৃত্যুদূত!

ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবারের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল, ঢোক গিলে বলল—কি চাও?

সমস্ত টাকা!

না না, তা হবে না, প্রাণ দেব তবুও টাকা দেব না—কে তুমি, আমি এখনই পুলিশ ডাকব।

পুলিশ তোমাকে ডাকতে হবে না, এখনই আসবে। শিগ্‌গির টাকাগুলো আমায় দিয়ে দাও।

না না, দেব না আমি টাকা।

দেখ, চিৎকার করলে এখনই তোমাকে হত্যা করব।

হত্যা!

হাঁ।

হেমাঙ্গিনী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল দরজার দিকে।

ছায়ামূর্তি বললো—কেউ আসবে না। পুলিশ তোমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

পুলিশ! ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি বলে উঠল–আমি তোমাকে পুলিশের হাতে দেব না। একটানে হেমাঙ্গিনীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রিভলবার চেপে ধরল, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল—শয়তানী, নারীহরণ করে যে পাপ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে আমার হাতেই ভোগ করতে হবে---সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি এবার দ্রুতহস্তে সিন্দুকের তালা খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো জামার চোরা পকেটে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বিন্দুকের তালা বন্ধ করে চাবিগোছা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের জানালা দিয়ে দোতলার নিচে বাগানে। এবার ছায়ামূর্তি রিভলবারখানা গুঁজে দিল প্রাণহীন হেমাঙ্গিনীর হাতের মুঠায়।

তারপর যে পথে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে পুলিশবাহিনীসহ ধনঞ্জয় রায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।

ইতোমধ্যে বিনয় সেন এসে দাঁড়াল ধনঞ্জয় রায়ের পাশে।

ধনঞ্জয় রায় বলে উঠল–বাড়ির ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ এল–ব্যাপার কি?

আমিও সেই শব্দ শুনে এদিকে ছুটে এলাম ইন্সপেক্টার সাহেব। চলুনত দেখি।

বিনয় সেন আগে আগে, পুলিশবাহিনী তাকে অনুসরণ করলো।

হেমাঙ্গিনীর কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায় ও বিনয় সেন। হেমাঙ্গিনীর রক্তাক্ত দেহটা একটা পাহাড়ের মতো মেঝেতে পড়ে আছে। দক্ষিণ হাতে তার রিভলবার এখনও ধরা রয়েছে।

বিনয় সেন বলে উঠল—হেমাঙ্গিনী পুলিশের আগমন জানতে পেরে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করেছে। কিন্তু এখানে আর বিলম্ব নয়, এই মুহূর্তে তার দলবল যারা এ বাড়িতে আছে তাদের পাকড়াও করতে হবে, চলুন।

ধনঞ্জয় রায় হেমাঙ্গিনীর লাশের নিকটে একজন পুলিশ পাহারা রেখে বিনয় সেনের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

যে কক্ষে হেমাঙ্গিনীর দল নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল প্রথমে সে কক্ষে প্রবেশ করল পুলিশবাহিনী।

পুলিশের দল কাউকে রাইফেলের গুঁতো আর কাউকে বুটের লাথি দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

ভীষণ আকার লোকগুলো জেগে উঠে হাবা বনে গেল। প্রত্যেকটা লোকের বুকের কাছে পুলিশবাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। সবাইকে গ্রেফতার করতে আদেশ দিলেন ধনঞ্জয় রায়। কিন্তু সেই অবসরে গুণ্ডাদের নেতা যে পাশের কামরায় ঘুমাচ্ছিল জেগে উঠেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিল, তারপর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়ল। লোকটার নাম ছিল গহর আলী।

বিনয় সেন কিন্তু গহর আলীকে দেখে ফেলল। এই মুহূর্তে তার পেছনে ধাওয়া করা উচিত মনে করল না সে, কারণ এখন তাকে এখানে বন্দী ঐ মেয়েদের উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হতে হবে।

পুলিশবাহিনী ততক্ষণে গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার করে ফেলেছে!

বিনয় সেন এবার সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলল, তার সঙ্গে ধনঞ্জয় রায় ও কয়েকজন পুলিশ।

যুবতীদের বন্দীকক্ষে প্রবেশ করে তাদের উদ্ধার করে নেয়া হল। একটি প্রাণীও এল না আজ পুলিশবাহিনীকে বাধা দিতে। যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ধনঞ্জয় রায়, বিনয় সেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—আপনার সহায়তায় এত বড় একটা জঘন্য নারীহরণ কারী দলকে অতি সহজে গ্রেফতারে সক্ষম হলাম, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ বিনয় বাবু!

বিনয় সেন হেসে বলল—আপনার সাহায্য না পেলে আজ আমি কিছুই করতে পারতাম না ইন্সপেক্টার সাহেব, এজন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

ধনঞ্জয় রায় এবং বিনয় সেন যখন নারীহরণকারী গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার ও যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে পুলিশ অফিস অভিমুখে ফিরে চললেন, ঠিক তখন জানবাগ হোটেলে ভীষণ লড়াই চলছে। পুলিশবাহিনী আর হেমাঙ্গিনীর গুণ্ডাদল মিলে চলেছে ধস্তাধস্তি—মারামারি।

কয়েকজন গুণ্ডা নিহত আর আহত হল। পুলিশদের মধ্যেও নিহত হল দু'তিনজন। তারপর গুণ্ডাদের পাকড়াও করতে সক্ষম হলো পুলিশবাহিনী। বাসুদেবও আহত হলেন জানবাগ হোটেলের ম্যানেজারের হাতে। ম্যানেজার বাসুদেবকে আহত করে পালাতে যাচ্ছিল কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হল না, অজ্ঞাত গুলির আঘাতে নিহত হল।

শেষ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী জয়ী হলো, জানবাগ হোটেলের কর্মচারীদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে চলল তারা।

❑

বনহুর অর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

বনহুর বলল—রহমান, জানবাগ হোটেলের ম্যানেজার তাহলে তোমার গুলিতেই নিহত হয়েছে?

হাঁ, সর্দার, দারোগাকে আহত করে ভাগছিল, বেটা, আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি।

ভালই করেছ রহমান।

সর্দার, নারীহরণকারী দল নিঃশেষ হল, এবার দেশে ফিরে যাওয়া হোক।

হাঁ, তাই যাব কিন্তু আরও ক'টা দিন আমাকে ঝিন্দে অবস্থান করতে হবে।

কেন সর্দার?

আরও কিছু কাজ বাকী আছে। হেমাঙ্গিনীর সিন্দুক থেকে বহু অর্থ আমি উদ্ধার করেছি, এই অর্থ আমি ঝিন্দের দীন-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই। কারণ, ঝিন্দের টাকা আমি নিয়ে যেতে চাই না।

সর্দার, আপনিই তাহলে হেমাঙ্গিনীকে—

হাঁ রহমান, আমি হেমাঙ্গিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর দক্ষিণ হাত গহর আলী নামে এক ব্যক্তি সে এখনও জীবিত, এখনও পলাতক। যাক, ওকে আমি যেখানেই পাব, চিনতে পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই। রহমান, তুমি ছদ্মবেশে ঝিন্দ শহরে দীন-দুঃখীদের মধ্যে সন্ধান নাও সত্যিকার দুঃখী লোক কারা এবং তাদের কি সাহায্য প্রয়োজন, সেই মত তাদেরকে অর্থ সাহায্য করবে।

আচ্ছা সর্দার।

এবার বনহুর তার অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিল।

রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

ঝিন্দ নদীর বালুকাময় তীর বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যু বনহুর আর রহমানের অশ্ব।

বিনয় সেন এক সময় মনিরার সঙ্গে সুফিয়ার দেখা করার সুযোগ করে দিল।

মনিরাকে দেখামাত্রই সুফিয়া চিনতে পারল। কারণ ওরা একই সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বন্দীখানায় ছিল। মনিরাকে দেখতে পেয়ে সুফিয়া জড়িয়ে ধরল, আনন্দে অধীর হয়ে বলল—তুমি এখানে কি করে এলে?

মনিরা বলল—যিনি তোমাকে এখানে এনেছেন তিনি আমাকেও এনেছেন, তার দয়াতেই আমি হেমাঙ্গিনীর অভিশপ্ত নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। সত্যি বোন, আমরা উভয়েই আজ তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে অনেক দুঃখের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। সুফিয়া কি করে দুষ্ট শয়তানদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে; কিভাবে রাজকর্মচারী বিনয় সেন তাকে উদ্ধার করলেন এবং তাকে বোনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন সব খুলে বলল সুফিয়া মনিরার কাছে।

একেই মনিরা বিনয় সেনের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল, সুফিয়ার মুখে তার আরও প্রশংসা শুনে অনেক খুশি হল।

বিনয় সেন এই দুই যুবতীর মধ্যে দেখা দিত দুই আকারে। সুফিয়া জানে, বিনয় সেন সুন্দর সুপুরুষ যুবক। আর মনিরা জানে, বিনয় সেন প্রৌঢ় অমায়িক মহৎ হৃদয় এক ভদ্রলোক।

কিন্তু আসল পরিচয় তার কেউ জানে না–কে এই বিনয় সেন!